গীতা-ধ্যান

দ্বিতীয় খণ্ড

"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥"

৬।৩২

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীহরিপুরুষঃ

উৎসর্গ

পিতঃ !

শৈশবে আপনাকে দেখিয়াছি—
ব্যাধিতে চক্ষু ও কর্ণের শক্তি প্রায় লুপ্ত,
কিন্তু শাস্ত্রানুশীলনবৃত্তি সুদ্দীপ্ত।
আপনার তৃপ্ত্যর্থে, কর্ণকুহরে অতি উচ্চৈঃস্বরে
পাঠ করিয়া শুনাইতাম, কত বড় বড় শাস্ত্রগ্রন্থ
অতি অল্প বয়সে, আপনার আদেশে।
রাত্রিতে স্নেহপাশে শয়নে
শুনিতাম, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধকাহিনী,
আদ্যোপান্ত আঠার পর্ব্ব ছিল আপনার কণ্ঠে।
সেই মুখে-শোনা ও কাণে-পড়া
শাস্ত্রকথা আজও জীবনপথে মণিদীপ।
আপনার অন্ধ-হস্তের দণ্ড ধরিত আমার শিশু-হস্ত,
আজ, আমার শিশু-সাধনার মানদণ্ড

গীতা-ধ্যান

অর্পণ করিলাম আপনার স্বর্গীয় হস্তে।
আমি আগে চলিয়া আপনাকে পথ দেখাইতাম,
আজ আপনি আগে চলিয়া
আমাকে পথ দেখান।

অকৃতী সন্তান

মহানাম

গীতা কোন দল গড়ে নাই

নিউইয়র্ক ষ্টেটের একটা সহর। বক্তৃতা করিতে গিয়াছি। ট্রেনে পৌঁছিয়া গিয়াছি বক্তৃতার নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেকক্ষণ পূর্ব্বে। বসিয়া আছি একাকী। লোকজন আসে নাই তখনও।

নিকটেই একটি বিদ্যায়তন। একটা সেমিনার। এই সেমিনারের উদ্যোগেই সভা। ওখানকার লাইব্রেরীয়ান হিউম সাহেব আমাকে ডাকিলেন, বলিলেন, "আমাদের লাইব্রেরী দেখুন।" নিজেই দেখাইতে লাগিলেন। সবশেষে একটা কোঠায় নিলেন। তাহার দুয়ারে বিজ্ঞাপন "গীতা সেক্‌সন্।"

সাহেব কয়েকটি আলমারী খুলিয়া দিলেন। আমাকে বলিলেন, "দেখুন এইবার আপনাদের গীতা। বিভিন্ন প্রকারের প্রায় দেড় হাজার গীতা আমাদের আছে। আমরা গীতাকে শ্রদ্ধা করি। এখানে সপ্তাহে একদিন গীতার ক্লাস হয়।" বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন ব্যাখ্যানসহ দেড় হাজার গীতার একত্র সমাবেশ দেখিয়া আমার দেহে পুলক হইল।

হিউম সাহেব বলিলেন, "পৃথিবীর সকল সভ্যজাতির ভাষায় গীতার অনুবাদ হইয়াছে। পৃথিবীর ধর্ম্মশাস্ত্রের বাজারে বাইবেলের বিক্রয় সর্ব্বাধিক। তাহার পরেই গীতার স্থান। সাহেবের এই সুন্দর উক্তিটি আমি অন্তরে গাঁথিয়া রাখিলাম।

কিছুক্ষণ পর যথাকালে সভা আরম্ভ হইল। আমি ধর্ম্মকথা বলিতে বলিতে গীতার প্রসঙ্গ তুলিলাম। হিউম সাহেবের কথা উদ্ধৃত করিলাম। বলিলাম, "এইমাত্র লাইব্রেরীর মিঃ হিউম আমাকে বলিলেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্রের বাজারে বাইবেলের পরেই গীতার স্থান। তাঁহার এই কথা ধরিয়া আমি একটি নূতন সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি। সিদ্ধান্তটি এই যে, বাইবেল অপেক্ষাও গীতার মর্য্যাদা অধিক। এইরূপ বিচিত্র সিদ্ধান্ত আমি কেন করিতেছি তাহার হেতু বলিব।

আপনাদের বাইবেল যে বাজারে চলে তাহার পিছনে আছে বাইবেল সোসাইটির লক্ষ লক্ষ টাকা। আছে পাদ্রী মিশনারীদের অক্লান্ত খাটুনি। পক্ষান্তরে গীতার পিছনে এইরূপ কিছুই নাই। একটি বস্তু চলিতে পারে দুই প্রকারে, হয় ঠেলায়, না হয় টানে—হয় Push, নয় Pull. বাইবেল চলিতেছে পিছনের ধাক্কায়। গীতা চলিতেছে বিশ্ব-মানবের প্রাণের টানে। কাহার মহত্ত্ব কিরূপ আপনারাই বিচার করুন।

যদি পরীক্ষা করিতে চান—একবছর বাইবেলের পিছনের প্রচারণের ধাক্কাটা থামান। অথবা তাহা না পারিলে এক বছর গীতার পিছনে কিছু খরচ করুন। প্রতি রবিবারে গির্জ্জার উপাসনান্তে একটিবার মাত্র বলিবেন, "গীতা ভা'ল গ্রন্থ—সকলেই পড়িতে পারেন।" দেখুন না সেই বছর গীতা বিক্রয় কিরূপ হয়। বাইবেলের সমান তো হইবেই, ছাড়াইয়া যাওয়াও বিচিত্র নয়।"

কথাটা বলিবার সময় আমি ভাবিয়াছিলাম হয়ত কেহ কেহ অসন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু বক্তৃতার পর তাহা মনে হইল না। সকলের মুখেই আনন্দের হাসি দেখিলাম। বহু সজ্জন আসিয়া আমার আশে পাশে ভিড় জমাইলেন। অনেকে করমর্দ্দন করিলেন—কহিলেন, "আমরা গীতা ভালবাসি।" একজন থিওসফিষ্ট (Theosophist) বলিলেন, "আমরা তো গীতাকেই বাইবেল করিয়া লইয়াছি।" আমি বলিলাম, গীতা ও বাইবেলে প্রচারিত মূল তত্ত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এই দেখুন বাইবেল বলিয়াছেন—

"Love thy Lord with all thy Soul
With all thy mite with all thy spirit."

গীতাও বলিয়াছেন—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"
কথা একই হইল।

থিওসফিষ্ট সাহেব বলিলেন, "কথা একই, তবুও একটু তফাৎ আছে। বাইবেলের উপর একটা creed (মতবাদ) তৈয়ারী হইয়াছে। গীতার উপর তাহা হয় নাই।"

সাহেবের সত্য দৃষ্টি দেখিয়া আমার আনন্দ হইল। আমি হাসিয়া বলিলাম, 'ঠিকই বলিয়াছেন। গীতায়—আপনি কি মানেন বা বিশ্বাস করেন তাহা বড় কথা নয়—আপনি কি করেন তাহাই বড় কথা। Not what you believe but what you do, matters. গীতায় আপনার Belief বড় কথা নয়, আপনার Behaviour বড় কথা। গীতার মত লইয়া কোন দল গড়ে নাই। তাইতো গীতা সকল দলের উপরে রহিয়াছে।"

ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ের আচার্যপাদেরাই গীতায় গভীর শ্রদ্ধাবান্। তাঁহারা বলিয়াছেন—

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥'

গীতা-গ্রন্থখানিকে ভালভাবে পাঠ করিতে হইবে। দায়সারাভাবে নিয়ম রক্ষা নয়। সুগীতা কর্ত্তব্যা। অতি সুষ্ঠুভাবে গীতার্থ ধ্যান করতঃ এই একটি গ্রন্থ সুষ্ঠুভাবে অধীত থাকিলে আর কোন শাস্ত্র আলোচনা না করিলেও চলিবে। যাহা কিছু জ্ঞাতব্য সবই গীতা দিয়াছেন। কল্যাণের পথে চলিয়া সত্য শাশ্বত ভূমিতে পৌঁছিতে যাহা কিছু প্রয়োজন সবই আছে গীতায়।

এই ক্ষুদ্রায়তন একটি গ্রন্থের এত গৌরব কেন, তাহা বলি শুনুন। মনে করুন, কোন বন্ধুর গৃহে যাইবেন। বাহির হইয়াছেন পথে। কিন্তু চিনেন না তাঁহার বসতি স্থান। পথচারীদের জিজ্ঞাসা করেন। এক এক জন এক এক পথ দেখান। সকলেই নিজ পথ ঠিক বলেন। অন্যপথ ভ্রান্ত বলিয়া মন্তব্য করেন। আপনি কেবল ঘুরিতেছেন।

ঘুরিতে ঘুরিতে দৈবক্রমে আপনার দেখা হইল যাঁহার গৃহে যাইবেন তাঁহার সঙ্গেই। তিনি বলিলেন—"আমার বাড়ী যাইবার এই পথ। আসুন।" ইহার পরও কি আপনি আবার কোন পথচারীর কাছে পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিবেন! যাঁর বাড়ী যাইবেন তিনিই যখন পথ-প্রদর্শক তখন আর চিন্তা কি?

"যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা।"

পদ্মনাভ শ্রীগোবিন্দের মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃতা গীতার বাণী জগজ্জীবের সর্ব্বোত্তম পথ প্রদর্শক।

শ্রীমুখপদ্মবিগলিত গীতামধু সকল ভক্ত-ভ্রমরের তৃপ্তি বিধান করুক।

জয় জগদ্বন্ধু

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

এক	যজ্ঞ (তৃতীয় অধ্যায়)	১
দুই	"লোক-সংগ্রহ"	৬
তিন	নৈতিক সমস্যার সমাধান	১২
চার	"এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ" (চতুর্থ অধ্যায়)	২০
পাঁচ	"যে যথা তাং স্তথা"	৩০
ছয়	"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং"	৩৮
সাত	"গহনা কর্ম্মণো গতিঃ"	৪৮
আট	দ্বাদশ যজ্ঞ (ক)	৫৬
নয়	দ্বাদশ যজ্ঞ (খ)	৬৩
দশ	"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং"	৬৮
এগার	চতুর্থ অধ্যায়ের উপসংহার শ্লোক	৭৫
বার	কর্ম্মসন্ন্যাস প্রকরণ (পঞ্চম অধ্যায়)	৮১
তের	স্বভাব প্রকরণ	৮৮
চৌদ্দ	সমদৃষ্টি প্রকরণ	৯১
পনের	ধ্যান প্রকরণ	৯৪
ষোল	পঞ্চম অধ্যায়ের উপসংহার	৯৬
সতের	ষষ্ঠ অধ্যায়	৯৮
আঠার	মনঃসংযম প্রকরণ	১০৪
উনিশ	যোগভ্রষ্ট প্রকরণ	১০৬
কুড়ি	প্রথম ষট্‌কের উপসংহার	১০৯

গীতা-ধ্যান

তৃতীয় অধ্যায়

যজ্ঞের কথা

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের নাম 'কর্মযোগ'। এই অধ্যায়ে তেতাল্লিশটি মন্ত্র আছে। প্রথম দুইটি মন্ত্রে অর্জ্জুনের প্রশ্ন। তিন হইতে আটমন্ত্র পর্য্যন্ত প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

নবম মন্ত্র হইতে একটি নূতন সুরে নূতন ভাবের অবতারণা। ভাবটির ভিত্তি যজ্ঞ-তত্ত্ব, সুরটির আবেদন বিশ্বজনীন। সৃষ্টির মূলে যজ্ঞ, সৃষ্টি রক্ষায় যজ্ঞ, এই ভাবে যজ্ঞের অপরিহার্যতা স্থাপন করিয়া গীতার বক্তা সমস্ত কর্মকে যজ্ঞের দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন।

সতের হইতে চব্বিশ শ্লোক পর্য্যন্ত যাঁহাদের কর্ম যজ্ঞময় তাঁহাদের কথা বলিলেন। তাঁহারা হইলেন জনকাদির মত আত্মতৃপ্ত জ্ঞানী, ও ভগবান্ স্বয়ং। ইঁহাদের কর্ম যজ্ঞে পরিণত হইয়া "লোক-সংগ্রহ" নামে ব্যাপক সামাজিক রূপ লইয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা কেবল লোক-সংঘট্ট বাড়ায়, তাহারা অজ্ঞান। তাহাদের সঙ্গে জ্ঞানীর পার্থক্যের কথা পঁচিশ হইতে উনত্রিশ মন্ত্র পর্য্যন্ত কহিয়াছেন।

অতঃপর ত্রিশ হইতে পঁয়ত্রিশ মন্ত্র পর্য্যন্ত, শ্রীভগবানে সর্ব্বকর্ম সমর্পণের দ্বারা কর্মযজ্ঞের পূর্ণতা ও তৎপথের সন্ধান দিয়াছেন।

ছত্রিশ শ্লোকে অর্জ্জুন প্রশ্ন তুলিয়াছেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাপে প্রযুক্ত হই কেন ? ভগবান্ উত্তরে রজঃ তমঃ দুইটি শত্রুর স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া তাহাদিগকে বধ করিবার বিধান দিয়াছেন। এইরূপে অধ্যায় শেষ হইয়াছে।

এই গেল অধ্যায়ের বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ। ইহার পরে কিঞ্চিৎ বিশদ আলোচনা। অর্জ্জুনের প্রশ্ন ও তাহার উত্তর লইয়া অনেক কথা বলা হইয়াছে ও আরও হইবে। বর্ত্তমানে "যজ্ঞ" ও "লোক-সংগ্রহ', এই নূতন কথা দুইটি লইয়া ধ্যান করা কর্ত্তব্য।

জ্ঞান ও কর্ম এই দুইয়ের সমাধান লইয়া যত উদ্বেগ। মনে হয়, এই দুইয়ের সমন্বয় হইতে পারে না। জ্ঞান অনেক বড়, কর্ম অনেক ছোট। জ্ঞান উদার, ব্যাপক, বিশ্বজনীন, মুক্তির হেতু, পরম পবিত্র বস্তু। পক্ষান্তরে কর্ম ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ, ব্যক্তিগত বন্ধনের হেতু, অতএব নিতান্ত হেয় বস্তু। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া জ্ঞানীরা কর্মকে কাছে ঘেঁসিতে না দিয়া অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া রাখিয়াছেন। আজ ভগবান্ হেয় কর্মকে উপাদেয় করিয়া মহাসাধন ভূমিতে উন্নীত করিতেছেন। এই কার্যটি করিবার উপায় হইল—কর্মকে যজ্ঞবেদীতে উত্তোলন।

অন্য কর্ম বন্ধনের হেতু, কিন্তু যজ্ঞ-কর্ম বন্ধনের কারণ নহে। অন্য কর্ম ক্ষণিক, কিন্তু যজ্ঞ-কর্ম অনাদিকাল হইতে প্রজাসৃষ্টির সঙ্গেই আছে। অন্য কর্ম মরণের পথে নিয়া যায়, কিন্তু যজ্ঞাবশেষ অমৃতপানে জীব শাশ্বত ব্রহ্মলোকে যায়। যজ্ঞ প্রতিনিয়ত বর্দ্ধনের হেতু (প্রসবিষ্যধ্বম্), দেবতাগণ পর্য্যন্ত যজ্ঞের দ্বারা তৃপ্ত (যজ্ঞ-ভাবিতাঃ)। যে যজ্ঞ করে না, সে পাপ ভোজন করে (ভুঞ্জতে তে

স্বঘং), সে চোর (স্তেন এব)। পক্ষান্তরে যজ্ঞ সর্ব্বপ্রকার বাঞ্ছিত ফলপ্রদ (ইষ্টকামধুক্)। অধিক আর কি বলা যায়, যজ্ঞ ভিন্ন অন্য কর্ম মানুষকে স্বরূপচ্যুত করিয়া ভ্রষ্ট করে। আর যজ্ঞে ব্রহ্ম সর্ব্বগত হইয়া নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকেন। অতএব সকল কর্মকে যজ্ঞ করিয়া লইতে পারিলেই তাহার সকল অপরাধ কাটিয়া যায়। ভৌমকর্ম যজ্ঞে পরিণত হইলে ভূমার সন্ধান আনে। স্বল্প জ্ঞান সম্যক্ জ্ঞানে পরিণত হয়।

সকল জড়ীয় কর্মকে স্পর্শ দ্বারা সুবর্ণ করে যে যজ্ঞ নামক স্পর্শমণিটি, সেটি কি বস্তু? আচার্য্য শঙ্কর তৈত্তিরীয়-সংহিতার "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" এই বচন অনুসারে যজ্ঞ বলিতে স্বয়ং বিষ্ণুকেই বুঝিয়াছেন। কেহ বলেন, যজ্ঞ ও বিষ্ণু একেবারেই এক হইলে "অহং যজ্ঞঃ" কথাটার কোন অর্থ ই হয় না। অতএব 'যজ্ঞ' অর্থে বিষ্ণুর আরাধনার্থ কৃত কর্মসমূহ।

কেহ বলেন, কেবল আরাধনার্থ কর্মই যজ্ঞ নহে। জীবনের যাবৎ ব্যাপারই যজ্ঞ, যদি তাহা ঈশ্বরার্থে করা যায়। গীতা আরো ব্যাপক অর্থে যজ্ঞকে লইয়াছেন। কেবল ঈশ্বর-প্রীত্যর্থে নহে, মানবের প্রীত্যর্থে—লোকসংগ্রহার্থে—ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের কল্যাণার্থে কৃত কর্মই যজ্ঞ। কেবল তাহাই নহে, নিজেকে ভুলিয়া যে কর্ম তাহাই যজ্ঞ।

দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্রপূত অগ্নিতে আহুতি দানকেই বৈদিক যজ্ঞ বলে। স্মৃতি, দেবতার উদ্দেশ্যে কথাটিকে ব্যাপক করিয়া ঋষির উদ্দেশ্যে, পিতৃগণের উদ্দেশ্যে, মনুষ্যের উদ্দেশ্যে, পশু-পক্ষ্যাদির উদ্দেশ্যে যথাযথ শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণকে যজ্ঞ বলিয়াছেন। কাহার

উদ্দেশ্যে অর্পণ করিতে হইবে কেবল সেদিকে অভিনিবেশ না করিয়া, কি বস্তু অর্পণ করিতে হইবে, সেই দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া গীতাকার বলিতে চাহেন, অগ্নিতে ঘৃত দিলেই যজ্ঞ হয় না। ব্রহ্মরূপ মহাগ্নিতে (ব্রহ্মাগ্নৌ) আত্মরূপ হবির উৎসর্গীকরণই প্রকৃষ্ট যজ্ঞ। যে কর্মে ক্ষুদ্র আমিত্বটা আহুতিরূপে সমর্পিত হইয়া গিয়াছে—তাহাই যজ্ঞ। কর্মযোগীর কর্মমাত্রই যজ্ঞ। অথবা কর্মকে যজ্ঞময় করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াই কর্মী কর্মযোগী হইয়া থাকেন।

এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডই একটা যজ্ঞ। শ্রুতি বলেন, এই যজ্ঞে যজ্ঞপুরুষ আপনাকে আপনি উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। তাই ইহা এত বৈচিত্র্যময় ও মনোরম। "বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং"। এই মহাযজ্ঞ—নিখিল বিশ্ব-যজ্ঞশালার সৃজন, পালন, লয়াদি—অনাদিকাল ধরিয়া চলিতেছে। শ্বাস-প্রশ্বাস হইতে আরম্ভ করিয়া নিবিড় ব্রহ্মানুভূতি পর্য্যন্ত যাবৎ প্রাণীর যাবৎ কর্ম এই যজ্ঞেই আহুতি পড়িতেছে (ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং)। এই যজ্ঞভূমিতে স্থিত হইয়া ঐ যজ্ঞানলে মানুষ যখন আপন আপন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর কর্মসকল আহুতি দিতে শিখে, তখনই তাহার কর্ম যজ্ঞে পরিণত হয়। তখনই তাহার পক্ষে "যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে" (৪।২৩) বাক্য সার্থক হইয়া থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়ে দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ, প্রাণযজ্ঞ ইত্যাদি বহুবিধ যজ্ঞের কথা বলিয়াছেন; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জ্ঞানযজ্ঞকে সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছেন। ব্রহ্মাগ্নিতে জীবাত্মাকে হোম করাই এই জ্ঞান যজ্ঞ।

কর্মযোগীর কর্ম আসিয়া যজ্ঞে পরিণত হইল। সকল যজ্ঞ চরমে পরম জ্ঞানযজ্ঞে সার্থকতা লাভ করিল। কর্ম পরিণত হইল যজ্ঞে, যজ্ঞ উন্নীত হইল জ্ঞানযজ্ঞে। কাজেই গণিতের মোটা হিসাবেও সমাধান পাওয়া গেল—

—"সর্ব্বং কর্মাখিলং পার্থ! জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" (৪।৩৩)। হে পার্থ! নিখিল কর্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়।

কর্মের জ্ঞানে পর্য্যবসান হইল। এই হইল গীতার সমুচ্চয়-পক্ষীর এক পক্ষ। কর্মী জ্ঞানীতে পর্যবসিত হইল, কিন্তু তাই বলিয়া জ্ঞানী কর্মী হইতে যাইবে কেন? কর্ম জ্ঞানের দুয়ারে আসিয়া ধন্য হইল কিন্তু জ্ঞান কর্মের দ্বারস্থ হইবে কোন অভাবে? এই উত্তরটা গীতাকারের মুখে শুনিতে পাইলেই পক্ষীর অপর পক্ষের উদ্গম হইবে। আমরা ক্রমে তাহা শুনিব।

দুই

লোক-সংগ্রহ

কর্ম যজ্ঞভূমিতে আরোহণ করিয়া জ্ঞানযজ্ঞে পরিসমাপ্তি লাভ করিবে, একথা আমরা বুঝিয়াছি। এখন জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে, কর্মীর জ্ঞানী হওয়া দরকার, কিন্তু জ্ঞানীর কর্ম করার প্রয়োজনটা কি? জ্ঞান কেন আপনার মর্য্যাদার উচ্চভূমি ছাড়িয়া কর্মের জঞ্জালের মধ্যে নামিয়া আসিবে, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতেছে।

জ্ঞান একটি ভাবানুভূতি বিশেষ। ভাবরাজ্যের অনুভূতি মাত্রেরই বস্তুরাজ্যে একটা অভিব্যক্তি থাকিবে। অনুভব শূন্যে বিচরণ করিবে না, তাহার কোনও প্রকার ক্রিয়াকারিত্ব থাকিবেই। কোনও ব্যক্তি লোভী, অথচ তাহার কোনও বস্তুতে লোভ নাই, অথবা ক্রোধী, কিন্তু কোনও ব্যক্তির উপর ক্রোধ নাই—একথার যেমন অর্থ হয় না, ঠিক তেমনই কোন মানুষ জ্ঞানী, অথচ কোনও কর্মের মধ্য দিয়া সেই জ্ঞান আপনাকে প্রকাশ করে না, এমনটি হয় না।

যাঁহারা জ্ঞানকে হিমাচলের উচ্চশৃঙ্গে উপলব্ধির আসনেই বসাইয়া রাখিতে চাহেন, গীতা তাঁহাদিগকে জ্ঞানী বলিতে চাহেন না। কর্পূরের সত্তা যেরূপ গন্ধরূপে আপনাকে বিতরণেই সার্থক—জ্ঞানও সেইরূপ নিয়ত কর্মের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করিয়া অভিব্যক্ত হইয়াই চরিতার্থ।

সাধারণ নরনারী সকলেই সৎ অসৎ কর্ম করে। কর্ম না করিয়া কেহই এক দণ্ড তিষ্ঠিতে পারে না। জ্ঞানীও যদি সেই

কর্মই করে তাহা হইলে সাধারণ জীবের সহিত তাহার ভেদটা কোথায় থাকিল? গরীবের ছেলে মাথায় বোঝা বয়, বড় লোকের ছেলেও তাহা করিলে তাহার বিশেষত্ব রহিবে কোথায়? উত্তরে গীতা বলেন, জ্ঞানটা ভাবরূপ, সুতরাং ভেদ রহিবে ভাবনারাজ্যে, বিশেষত্ব থাকিবে অনুভূতিতে—মানসিক ধ্যানে। গরীবের ছেলে বোঝা বহিবে নিজের জন্য, বড়লোকের ছেলে বহিবে পরের জন্য। সাধারণ লোক কর্ম করিতেছে ইন্দ্রিয়ারাম হইয়া, ইন্দ্রিয়ের তৃপ্ত্যর্থে; জ্ঞানী কর্ম করিবে আত্মারাম হইয়া, পরমাত্মার, জীবের প্রীত্যর্থে। সাধারণ নরনারী কর্ম করিতেছে নিজের হিতের জন্য কিংবা আসক্ত হইয়া, পুত্রকন্যাদি মুষ্টিমেয় লোকের হিতের জন্য; পক্ষান্তরে জ্ঞানী কর্ম করিবে অনাসক্তভাবে সর্ব্বভূতহিতে রত হইয়া।

অজ্ঞান, জ্ঞানী, অবিদ্বান্, বিদ্বান্, ইহাদের ভেদ ঐ ব্যবধানের দ্বারাই সুস্পষ্ট রহিবে। কর্মের মহত্ত্বেই জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠত্ব ব্যক্ত হইবে—কর্মহীনতায় নহে। বৃহৎ কর্মের প্রতিও অজ্ঞানীর দৃষ্টি সংকীর্ণ, পক্ষান্তরে আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও জ্ঞানীর কর্ম অনুভবের বিশালতায় এবং তাৎপর্য্যের গভীরতায় মহৎ ও ব্যাপক। যে মহদ্ব্যাপ্তির পটভূমিকায় জ্ঞানীর কর্ম বিদ্যমান, গীতার ভাষায় তাহার নাম লোক-সংগ্রহ।

জ্ঞানী কর্ম করিবেন লোক-সংগ্রহের জন্য। সাধারণ জীবের কর্ম দ্বারা লোক-সংঘট্ট বাড়ে, জ্ঞানীর কর্মে লোক-সংগ্রহ বর্দ্ধিত হইবে ও পূর্ণতার দিকে পরিণতি লাভ করিবে। হাটের সহস্র লোকের কোলাহল আর সুশৃঙ্খলিত সহস্রকণ্ঠে সমভাবে

গীত সঙ্গীতে যে পার্থক্য, সংঘট্ট ও সংগ্রহে সেই পার্থক্য। অজ্ঞানীর ও জ্ঞানীর কর্মেও সেই পার্থক্য।

কোলাহলও কণ্ঠস্বর, সঙ্গীতও কণ্ঠস্বর। কোলাহলের মধ্যে শৃঙ্খলা নাই, ছন্দঃ নাই, একতানতা নাই। সঙ্গীতে তাহা আছে। কোলাহলে প্রত্যেকে কথা কয় নিজ প্রয়োজনের তাগিদে, অন্যের প্রয়োজন ছাপাইয়া নিজের প্রয়োজন জাহির করিতে, সমষ্টিকে ছাপাইয়া ব্যষ্টিকে দাঁড় করাইতে। সমকণ্ঠ সঙ্গীতে কাহারও জয় পরাজয়ের প্রসঙ্গ নাই। কাহারও কণ্ঠের স্বরগ্রাম কাহাকেও লঙ্ঘন করিলেই ঘটে লক্ষ্যস্থানীয় একতানতার অপমৃত্যু। সঙ্গীতে সম্মিলিত লক্ষ্য হইল লয়-যতি-যুক্ত একটি বিশিষ্ট ছন্দ ও শৃঙ্খলার রূপায়ণ।

সংঘট্ট ক্ষুদ্র, বিশ্লিষ্ট, অনৃত। সংগ্রহ ব্যাপক, সুসম্বদ্ধ ও 'ঋত'। সংঘট্ট কোলাহলের মত অসংলগ্ন—লক্ষ খণ্ড। সংগ্রহ সঙ্গীতের মত সুনিয়ন্ত্রিত অখণ্ড একক সর্ব্বসমষ্টি। অজ্ঞানের কর্ম খণ্ড আরও খণ্ড হইয়া জঞ্জাল পুঞ্জীভূত করে, জ্ঞানীর কর্ম সকল খণ্ডকে অখণ্ডতার ভূমিতে লইয়া গিয়া পূর্ণতায় একীভূত করে। ইহাই জ্ঞানীর লোক-সংগ্রহ। "কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্ত-শ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্" (৩।২৫)।

খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড দর্শনই প্রকৃত জ্ঞান। গীতার ভাষায় বিভক্তের মধ্যে অবিভক্ত দর্শন। 'অবিভক্তং বিভক্তেষু' (১৮।২০)। বিশ্ব-তত্ত্বের সমগ্রতা অনুভবই জ্ঞানীর মুখ্য কার্য্য। "সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়ম্...."—সর্ব্বভূতে একটি অব্যয় ভাবের অপরোক্ষানুভূতিই জ্ঞান। এই ভূমিকায় জ্ঞাতা ও জ্ঞানের একত্ব

হইয়া যায়। জ্ঞানী তাঁহার ক্ষুদ্র সত্তাকে অখণ্ড সত্তায় আহুতি দিয়া জ্ঞানযজ্ঞ উদ্‌যাপন করেন। তখন তাঁহার আর কর্ম থাকে না। কর্ম যাঁহার নাই গীতা তাঁহাকেই কর্ম করিতে বলিতেছেন। এই কর্মহীনের কর্মই "লোক-সংগ্রহ"।

লোক-সংগ্রহ কথাটা গীতায় দুইবার আছে (৩।২০,-২৫), কথাটার গাম্ভীর্য্য অনুধাবন করা বেশ কঠিন। সংগ্রহ সংঘট্ট নহে, ইহা যেমন বলিয়াছি, তেমন লোক-সংগ্রহ যে দল-সংগ্রহ বা দলপুষ্টি নহে ইহাও জানা দরকার।

কোন মতবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে দল। অনেকে প্রাণপণ চেষ্টা করেন এই দলের লোক বাড়াইতে। এই কার্য্যের নাম দল-সংগ্রহ হইতে পারে, কিন্তু ইহা লোক-সংগ্রহ নহে। দল বাঁচে মতবাদ লইয়া, লোক বা মানব বাঁচে মানবত্ব ভোগ করিয়া—মনুষ্যত্বের অধিকারী হইয়া। মত মানাইতে পারিলে দল-সংগ্রহ হয়, লোক-সংগ্রহ অত সহজে হয় না। যাহারা মানবদেহ পাইয়াও মানবত্বের অমৃত আস্বাদন করে নাই, তাহাদিগকে মনুষ্যত্বের মহিমায় সকল মানবজাতির সঙ্গে একত্ববোধে একত্র করাই লোক-সংগ্রহ।

জনকাদি রাজর্ষিগণের এই লোক-সংগ্রহ ছিল জীবনের একটি প্রধান কার্য্য। ঋষি হইয়াও, তত্ত্বদ্রষ্টা মহাজ্ঞানী হইয়াও তাঁহারা কর্ম করিতেন এবং এই কর্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন (সংসিদ্ধিমাস্থিতাঃ—৩।২০)। লোকসংঘট্ট কমাইয়া লোক-সংগ্রহ সাধনই ছিল ইঁহাদের লক্ষ্য। ইঁহারা কোনও দলের লোক নহেন। বাহ্যতঃ গণ্ডীর মধ্যে থাকিলেও জ্ঞানী গণ্ডীর বহু ঊর্ধ্বে বিরাজিত।

রসিক কবি চণ্ডীদাস যে-"মানুষ"কে সবার উপরে বলিয়াছেন, ইঁহারা হইতেছেন সেই মানুষ। অমানুষকে মানুষ করাই হইল ইঁহাদের যাবৎ কর্মের মূল। এই কার্য্যই লোক-সংগ্রহ।

যে সকল গুণ থাকিলে মানুষ মানুষ হয়, মানুষ হইয়া "সবার উপরে" হয়, তাহা অনেক মানুষই লাভ করে নাই। মানবদেহ পাইয়াও যাহারা কেবল আহার নিদ্রা ভয়াদি পশুধর্মের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই, ঋষির কার্য্য হইল তাহাদিগকে মানবত্বে আনয়ন করিয়া জনসমাজে সভ্য সামাজিক করিয়া তোলা। ইহাই তাঁহাদের লোক-সংগ্রহ। আর্য্য ঋষিগণ যাহাদিগকে 'সংগ্রহ' করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরা অদ্যাপি গোত্র নামোল্লেখে তাঁহাদের পরিচয় দিয়া গৌরবান্বিত হন।

ঋষিগণের ধর্ম-প্রচারণ ছিল মানবত্বের প্রসার সাধনে পর্যাপ্ত। ইহাই লোক-সংগ্রহ। এই কার্যটি কেবল কথা দ্বারা হয় না। ইহার জন্য চাই অক্লান্ত সাধনা ও জীবনব্যাপী তপস্যাচরণ। যে সাধনা বহুত্বের মধ্যে একত্বকে দেখে, যে আচরণের মধ্যে জীবনের অখণ্ড সত্তা ফুটিয়া উঠে, লোক-সংগ্রহ কার্য্যেই তাহা পর্যাপ্ত।

পূত চরিত্র সম্মুখে থাকিলে অনুবর্ত্তী জন শীঘ্র মহত্ত্ব পদবী লাভ করিতে সক্ষম হয় (যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ—৩।২১)। এইজন্য সর্ব্বকর্মের অতীত পুরুষ হইয়াও পুরুষোত্তম স্বয়ং কর্মাচরণ করেন, জীবের কল্যাণের, শিক্ষার জন্য (ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং—৩।২২)। যিনি নিজে অনুভবী একমাত্র তিনিই তাঁহার ব্যবহারের উদারতায় অপরকে বড় করিয়া লইতে পারেন।

নিজে বড় হওয়া, সেই সঙ্গে সঙ্গে অপরকে বড় করা, ইহাই লোক-সংগ্রহ। যিনি স্বয়ং বড় ও অপরকে বড় করেন (বৃহত্ত্বাৎ —বৃংহণত্বাৎ) তিনি হইলেন সর্ব্বাতিশায়ী বৃহদ্বস্তু—ব্রহ্ম। যিনি ব্রহ্মে বিচরণরূপ ব্রহ্মচর্য্য করেন তিনিই জ্ঞানী; জ্ঞান তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতায় সর্ব্বভূতহিতে, মঙ্গলময় কর্মে আত্মোৎসর্গ করিয়া সন্নিহিত জনসমাজকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া লয়। "ব্রহ্মচর্য্য কর, করাও" প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের এই বাণীর মধ্যে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় বিদ্যমান।

কর্মীকে জ্ঞানী করিবে যজ্ঞ-কর্ম। জ্ঞানীকে কর্মে আনিবে লোক-সংগ্রহ। যজ্ঞবুদ্ধিতে কর্ম করিতে করিতে কর্মী জ্ঞানী হইয়া যাইবে। 'সর্ব্বলোক-মহেশ্বর'কে—(৫।২৯) জানিয়া সর্ব্বভূতহিতে রত হইয়া, লোক-সংগ্রহে স্বতঃপ্রবৃত্ত জ্ঞানী কর্মী হইয়া যাইবে। কর্মের দৃষ্টিকোণ হইতে যাহা যজ্ঞ, জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ হইতে তাহা লোক-সংগ্রহ। যজ্ঞ ও লোকসংগ্রহ এই দুই পক্ষে ভর করিয়া গীতার সাধক শান্তির লক্ষ্যে উড়িয়া চলিবেন—গীতাকার ইহাই চাহেন।

উড়িবার পথে বাধাবিঘ্ন আছে। বেগ কমিয়া গেলেই মাধ্যাকর্ষণ নীচে টানিয়া ফেলে। এই বাধাটা কোথাকার— ইচ্ছা নাই (অনিচ্ছন্নপি) তবু বলপূর্ব্বক পাপে নিযুক্ত করে (বলাদিব নিয়োজিতঃ)? অর্জ্জুন বাধার স্বরূপ জানিবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন (৩।৩৬)। অর্জ্জুনের এই জিজ্ঞাসা ও উত্তর আমরা এখন ধ্যান করিব।

তিন

নৈতিক সমস্যার সমাধান

(অধ্যায়ের শেষ প্রকরণ)

কর্ম্মকে যজ্ঞের দৃষ্টিতে দেখিয়া কর্মী, জ্ঞানী হইবে। জ্ঞানকে লোক-সংগ্রহ কার্য্যে রূপায়িত করিয়া জ্ঞানী, কর্মী হইবে। যজ্ঞ ও লোক-সংগ্রহ দুই পাখায় ভর করিয়া গীতার সাধক উড়িবেন, এ কথা বলা হইয়াছে। এখন পথের বাধাবিঘ্নের প্রসঙ্গ উঠিতেছে।

স্বধর্ম্মের কথা কিছু পূর্ব্বে হইয়াছে। প্রসঙ্গাধীনে গীতাকার স্বধর্ম্মের কথা আবার টানিয়া আনিয়া "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" (৩।৩৫) ইত্যাদি বিখ্যাত শ্লোক এই প্রকরণে বলিয়াছেন। স্বধর্ম কথাটা আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

কতকগুলি অংশ একত্রিত হইয়া যেমন একটা যন্ত্র তৈয়ারী হয়, অনেকটা সেইরূপ, কতকগুলি ব্যক্তি লইয়া একটি সমাজদেহ গঠিত হয়। যন্ত্রের অংশগুলি নানাস্থানে নির্মিত হইলেও সকলে একত্রিত হইয়া পরস্পরের পরিপূরকরূপে কার্য করে এবং ঐরূপ করাতেই সমষ্টির কর্ম সুশৃঙ্খলিত হইয়া থাকে। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির একটা নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা আছে। যার ভূমিকার যে কার্য্য তাহা সুষ্ঠুরূপে সমাধান করিলে সমষ্টিজীবন ছন্দোময় হইয়া উঠে। যার যে কাজ তাহা না করিলে বিশৃঙ্খলা অপরিহার্য্যরূপে দেখা দেয়।

ব্যক্তির এই নির্দ্দিষ্ট কর্মের নামই স্বধর্ম। কিঞ্চিৎ দোষযুক্ত

(বিগুণ) হইলেও স্বধর্মাচরণ সর্ব্বথা করণীয়। কোন কর্মের যাবতীয় আয়োজন সুষ্ঠু হইলেও যে-ভূমিকায় যাহার স্বভাবগত অধিকার নাই তাহার সেই ভূমিকায় অভিনয় বিপৎসংকুল—ভয়াবহ। অতএব প্রত্যেকেরই স্বধর্মে নিরত থাকা উচিত।

শ্রীভগবানের এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন বুঝিলেন যে, কথাটা যুক্তিযুক্ত বটে ; রথের সম্মুখের চাকা পিছনে লাগাইলে যে চলার পথে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু একটা মর্মান্তিক প্রশ্ন এই যে, কোন একটা কাজ সর্ব্বতোভাবে অকরণীয়, ইহা ভালভাবে বুঝিয়াও তাহা করি কেন? অন্যায় কার্য্য করিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই (অনিচ্ছন্নপি) তথাপি কে যেন বলপূর্ব্বক করাইয়া লয় (বলাদিব নিয়োজিতঃ)। মানুষ পাপকর্ম করে কিন্তু সকল সময়েই যে উহা স্বেচ্ছায় করে এমন মনে হয় না। যেন কাহারও দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া, বাধ্য হইয়াই অন্যায় করিতে হয়। এই বলপূর্ব্বক নিয়োগকারীটি কে? কোথায় তাঁহার অবস্থিতি স্থান, অর্জ্জুন ইহাই জানিতে চাহেন।

অর্জ্জুনের এই জিজ্ঞাসাটি সর্ব্বজনীন। আমাদের সকলের বুকের তলার প্রশ্নটি অর্জ্জুন মুখ ফুটিয়া বলিয়া দিয়াছেন। মানুষ মানুষকে কত সদুপদেশ দেয়, কিন্তু উপদেশ কে না জানে? উপদিষ্ট ব্যক্তিও ইচ্ছা করিলে উপদেষ্টাকে অনেক উপদেশ শুনাইয়া দিতে পারে। তবে পার্থক্য কোথায়? একজন উপদেশ অনুযায়ী আচরণ করে, অপরে করে না, এইখানেই ব্যবধান। আপনি চলেন, আমি চলিতে পারি না। কেন পারি না? তাহাই অর্জ্জুন জানিতে চাহেন। অর্জ্জুন নৈতিক

সমস্যার গোড়ার কথা তুলিয়াছেন। এই প্রশ্নের উত্তর শুনিতে আগ্রহী নহে এমন মানুষ নাই।

ভগবানের উত্তরটি সংক্ষিপ্ত। একটি শ্লোকেই উত্তর প্রায় দিয়া ফেলিয়াছেন। পরে তিনটি শ্লোকে বলা কথাকেই বিন্যাস করিয়াছেন। শেষের তিনটি শ্লোকে নিষ্কৃতির উপায় বলিয়া দিয়াছেন। উপায়টিকে আর বেশী বিশ্লেষণ করেন নাই, যথাস্থানে করিবার জন্য রাখিয়া দিয়াছেন। পাপাচরণের কারণ-নির্ণয় ও প্রতিকার বা নৈতিক সমস্যার সমাধান, সাতটি শ্লোকে সম্পূর্ণ।

প্রশ্নের সমাধানে ভগবানের শ্রীমুখোচ্চারিত কথা কম হইলেও উহার মর্মার্থ গভীর। কথা সংক্ষিপ্ত কিন্তু তাৎপর্য্য ব্যাপক। আমরাও ব্যাপকভাবেই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ভগবান্ প্রথমে কাম ও ক্রোধকে কারণ বলিয়াছেন, তাহার পরই এই উভয়ের জন্মস্থান বলিয়াছেন রজোগুণে, কাজেই সকল দোষ ন্যস্ত হইল রজোগুণের উপর। এইবারে রজোগুণের পরিচয় জানা দরকার। রজোগুণের পরিচয় উহার অপর দুই কুটুম্ব সত্ত্ব ও তমোগুণের সঙ্গে না হইলে পূর্ণাঙ্গ হয় না। কিন্তু ত্রিগুণ আলোচনা করিবার প্রকৃষ্ট স্থল ইহা নহে। শ্রীভগবান্ও করেন নাই। উহা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের জন্য রাখিয়া দিয়াছেন। তথাপি কথাটা বুঝিবার জন্য প্রসঙ্গাধীন কিছু আলোচনা করিতেই হইবে।

আমাদের দেহেন্দ্রিয়সংঘাত কতকগুলি বিকারজ বস্তুর সমষ্টি বা সংহতি। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (১৩।৫-৬) এ সমষ্টিকে ক্ষেত্র বলা হইয়াছে। ঐ বিকারজ বস্তুসকল মূলতঃ তিনটি গুণ হইতে

জাত। অর্থাৎ এই দেহেন্দ্রিয়-সংঘাত, ত্রিগুণের বিকার বা তাহা হইতে সৃষ্ট। ফলতঃ এই সংঘাতে যে-গুণের আধিক্য হয়, তাহা অন্য গুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হইয়া পড়ে।

ব্যঞ্জনাদি আহার্য্য প্রস্তুতে যেমন লবণ বা ঝাল অধিক হইলে তাহা ব্যঞ্জনের অন্যান্য গুণ বা আস্বাদকে ছাপাইয়া প্রকাশমান হয়, তদ্রূপ দেহেন্দ্রিয়-সংহতিতে যে-গুণের প্রবলতা হয় তাহা তৎকালে অন্য সকলের উপর রাজত্ব করিতে থাকে। কত যত্নে কত প্রকার আস্বাদনীয় দ্রব্যদ্বারা প্রস্তুত এই উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন কেহই খাইতে পারিল না কি জন্য—কোন পাচকের এই প্রশ্নের উত্তর যেমন—লবণের জন্য, ঠিক সেইরূপ যত্নে অর্জ্জিত বিদ্যা-বুদ্ধির বলে, অন্যায় কি বুঝিয়াও তাহাতে লিপ্ত হই কেন, অর্জ্জুনের এই জিজ্ঞাসার উত্তর—রজোগুণের জন্য।

"রজোগুণসমুদ্ভবঃ" এই একটি শব্দে প্রশ্নের উত্তর অন্তর্নিহিত! কাহার দ্বারা চালিত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাপাচরণে প্রবৃত্ত হই? উত্তর, রজোগুণের দ্বারা। ভগবান্ যেন বলিতেছেন, অর্জ্জুন! তোমার ঐ ব্যাধিটি সাময়িক বা আগন্তুক নহে। উহা শরীরের ধাতস্থ বা ধাতুগত। মৌলিক উপাদানের মধ্যেই উহার কারণ লুকাইয়া আছে।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রমতে যেমন বায়ু, পিত্ত, কফের ন্যূনাধিক্য দৈহিক ব্যাধি, ও ইহাদের সমতায়, স্বাস্থ্য হয়—মন, বুদ্ধি, অহংকারাত্মক এই ক্ষেত্রেও তদ্রূপ গুণের ন্যূনাধিক্যে নৈতিক প্রশান্তি বা অশান্তি উপস্থিত হয়।

সত্ত্বগুণের আধিক্য হইলে সুখাসক্তি ও জ্ঞানাসক্তি বর্দ্ধিত

হয় (১৪।৬), রজোগুণের আধিক্য হইলে কাম ক্রোধ বর্দ্ধিত হয় (১৪।৭), তমোগুণের আধিক্যে নিদ্রালস্য ও অবিবেক প্রকাশ পায় (১৪।৮)।

রজোগুণের প্রধান কার্য্য হইল কামনার সৃষ্টি। ঐ কামনা যদি সত্ত্বগুণের জ্ঞানদ্বারা সংযত থাকে তবে তেমন উদ্বেগজনক হয় না। যদি সত্ত্বকে ছাপাইয়া রজঃ বাড়িয়া উঠে, তাহা হইলে কামনা অপ্রতিহত গতিতে চলিতে থাকে। ফলে উহা যখন বাধা দ্বারা ব্যাহত হয় তখন ক্রোধের রূপ ধারণ করে। কাম্যবস্তুর প্রাপ্তির পক্ষে যে বাধক তৎপ্রতি সেই ক্রোধের গতি হয়। কাম ক্রোধ প্রবলতর হইয়া উঠিলে তাহারা মহাশত্রুতুল্য আচরণ করে।

কামনার বড় দোষ এই যে, উহা দুষ্পূরণীয়—কিছুতেই পূর্ত্তিলাভ করে না, তাই তাহাকে "মহাশন" বলিয়াছেন। কামনার দ্বিতীয় দোষ এই যে, উহার একটি আবরণাত্মক স্বভাব আছে। ধূম যেমন অগ্নিকে ঢাকে, ময়লা যেমন দর্পণকে ঢাকে, কাম সেইরূপ সত্ত্বগুণজাত জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে। কাম-ক্রোধের জনক রজোগুণের অধিষ্ঠান অর্থাৎ বসতিস্থান হইল ইন্দ্রিয়গণ, মন ও বুদ্ধি (৩।৪০)। এই আশ্রয়ে একবার রজোগুণের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে সত্ত্বগুণ অভিভূত হইয়া পড়ে, তমোগুণ প্রশ্রয় পায়। ফলে আসে জ্ঞানহীনতা ও মোহ। পাপাচরণ বৃত্তির তখন আর কেহ বাধক থাকে না। ক্ষীণ সত্ত্বগুণবশতঃ পাপে অনিচ্ছা থাকিলেও, প্রবল রজঃকে বাধা দিবার কেহ থাকে না।

ব্যাধির নিদান বা কারণনির্ণয় হইল। এক্ষণে ঔষধের

ব্যবস্থাপত্র দিতেছেন। রজোগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাকে কমাইতে হইবে। যে পরিমাণে সত্ত্বগুণ বাড়িবে সেই পরিমাণেই রজোগুণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। রাজসিক আহার বিহারাদি পরিত্যাগ করিলে রজোগুণ কমিতে থাকে। সাত্ত্বিক আচরণ ও অনুষ্ঠানের ফলে সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হয়। এই সকল কথা চতুর্দ্দশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিশেষ করিয়া কহিবেন। এখানে মাত্র একটি কথা বলিয়াছেন—ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত করিয়া (ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য) রজোগুণাত্মক কামকে পরিহার করিতে হইবে (প্রজহি)। ঔষধের ব্যবস্থা তেমন সুষ্ঠু হইল না। প্রশ্নটি থাকিয়াই গেল। ইন্দ্রিয়-সংযম কিরূপে করিব ইহাই যে মূল প্রশ্ন। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উত্তরে যদি বলা যায় ইন্দ্রিয় সংযম কর, তাহা হইলেও সুন্দর সমাধান পাওয়া গেল কই? ইহা বুঝিয়াই যেন উত্তরদাতা আরও গোড়ার কথা উল্লেখ করিয়া সমাধানের পথ নির্দ্দেশ করিতেছেন।

কাম-ক্রোধের জনক রজোগুণকে দুর্ব্বল করিতে হইলে উহার দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আঘাত করা সম্ভব নহে। বাহির হইতে আক্রমণ চালাইতে হইবে। রজোগুণের তিনতলা বাড়ী ; একতলায় ইন্দ্রিয়গণ, তদূর্দ্ধে মন, তদূর্দ্ধে বুদ্ধি। ইহাদের কোনও ভূমিকা হইতেই রজোগুণকে স্থানচ্যুত করিবার চেষ্টা সফল হয় না। কারণ স্বগৃহে সকলেই বলবান্। ইহাদের ঊর্দ্ধে, ইহাদের অপেক্ষা শক্তিশালী যদি কোন দুর্গ থাকে তাহা হইলে সেই দুর্গ অবলম্বনে রজোগুণকে বশীভূত করা সম্ভব। প্রশ্ন জাগে, বুদ্ধির ঊর্দ্ধে, তদপেক্ষা উপরিতন ভূমিতে অধিকতর সামর্থ্যশালী কোন

আশ্রয় আছে কি না? গীতার উত্তর—আছে, "যো বুদ্ধেঃ পরতস্ত্ব সঃ।"

রজোগুণাত্মক কামাদিকে ধূমের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। (ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নিঃ) ধূম যেমন বহ্নিকে ঢাকে, রজোগুণের সেইরূপ একটা আবরণাত্মিকা প্রকৃতি আছে। এই দৃষ্টান্ত দৃষ্টে বুঝা যায় যে, আবরণাত্মক ধূম হইতে আবৃত বহ্নি মহত্তর বস্তু। বহ্নি ধূমের প্রাণ। বহ্নি হইতেই সে সঞ্জাত। বহ্নির অত্যন্তাভাব হইলে ধূম থাকিবে না। আবার বহ্নি উত্তমরূপে প্রজ্বলিত হইলেও ধূম থাকিবে না। বহ্নি উত্তমরূপে প্রজ্বলিত হইতেছে না বলিয়াই ধূমের সত্তা ও আবরণ প্রয়াস।

রজোগুণের সত্তা, রজোগুণের ক্রিয়াভূমি ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সত্তা টিকিয়া আছে যে মহাবস্তুর আশ্রয়ে বা অবলম্বনে, তাহা তদপেক্ষা বিরাট, ব্যাপক ও সমর্থ। সেই ভূমিতে দাঁড়াইলেই, সেই দুর্গে আশ্রয় লইলেই, ইন্দ্রিয়াদির সংযমন ও রজোগুণাদির বিতাড়ন সম্ভবপর। সেই সর্ব্বোচ্চ স্থানই শুদ্ধসত্ত্বময় আত্মিক-ভূমি—"যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।"

"সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা"—এই ক্ষুদ্র বাক্যটির মধ্যেই ঔষধের ব্যবস্থাপত্র। দুইটি আত্মশব্দ আছে। একটি তৃতীয়ান্ত করণ-কারক, অপরটি দ্বিতীয়ান্ত কর্ম্ম। করণকারক আত্মাই "বুদ্ধেঃ পরং" বুদ্ধির অতীত নিত্য আত্মা। কর্মকারক আত্মা হইল অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইত্যাদি রজোগুণের যাবৎ আবাসভূমি। আত্মা দ্বারা আত্মাকে সমাহিত করিয়া শত্রু জয় কর (জহি শত্রুম্)।

কেনোপনিষদের প্রারম্ভে কোন অন্তেবাসী আচার্য্যকে প্রশ্ন করিতেছেন—আমাদের মন, প্রাণ, কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়—এগুলি কাহার প্রেরণায় কাজ করে? কোন্ দেবতা ইহাদের অনুপ্রেরক ও শক্তিবিধায়ক? ঋষি উত্তর দিয়াছেন,—মনের মন, প্রাণের প্রাণ, বাকের বাক্, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র—একটি মহাতত্ত্ব-বস্তু আছে। এই বস্তুদ্বারাই মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকার কর্মে প্রেরিত ও জীবন্ত। উপনিষদের ঋষি বলেন, ঐ তত্ত্বকে জানিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়।

গীতাও সেই কথাই বলেন। 'আত্মনা' শব্দদ্বারা গীতা সেই বস্তুকেই লক্ষ্য করিয়াছেন এবং উহা দ্বারা মন বুদ্ধি সংযত করিতে, স্তব্ধ বা নিশ্চল করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

আমাদের মন-প্রাণ-বুদ্ধি তাবৎ পর্য্যন্তই রজোগুণের আশ্রয়-স্থল হইয়া চঞ্চল ও অস্থির হয়, যাবৎ পর্য্যন্ত না শুদ্ধসত্ত্বময় আত্মার আলোক দর্শন করে। শুদ্ধ চৈতন্যের সাক্ষাৎকারে সে প্রথম স্থির হয়, তারপর তাহার আলোতে ভাস্বর হয়, তারপর আরও ঘনিষ্ঠতায় সঞ্জীবিত, সন্দীপিত ও মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া উঠে। সত্যকার আমি কে, এই স্বরূপ জ্ঞানে স্থিত হইলে সেই জ্ঞানের জ্যোতিতে রজস্তমোগুণ বিদূরিত হয়। শুদ্ধসত্ত্বগুণ বিকশিত হয়। এইখানেই ভাগবত জীবনের বদ্রী-বিশাল। "সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা" বাক্যে শুদ্ধ ভাগবতীয় জীবনযাত্রার প্রথম ধ্বজারোপণ।

চার

চতুর্থ অধ্যায়

"এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ"

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের নাম জ্ঞানযোগ। ইহা পাঁচটি প্রকরণে বিভক্ত। প্রথম দশ শ্লোক পর্য্যন্ত অবতার-প্রকরণ। চারিটি শ্লোকের একটি ক্ষুদ্র প্রকরণে ঈশ্বরের বৈষম্যভাব কীর্ত্তন। পনের হইতে চব্বিশ শ্লোক পর্য্যন্ত কর্ম-প্রকরণ—কর্মানুষ্ঠানের কৌশল ও কর্মের ব্রহ্মময়ত্ব প্রতিপাদন। পঁচিশ হইতে একত্রিশ শ্লোক পর্য্যন্ত দ্বাদশবিধ যজ্ঞের প্রকরণ। শেষে একাদশটি শ্লোকে জ্ঞানের স্বরূপ, সাধনা, ফল ও সামর্থ্য কথন—জ্ঞান-প্রকরণ।

অবতার-প্রকরণ আমরা অর্জ্জুনের প্রশ্ন প্রসঙ্গে পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। "এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ" (৪।৯)—এই বিশেষ কথাটি এই নিবন্ধে আলোচ্য।

অবতারের কথা আলোচনার পর শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন, অর্জ্জুন, আমার জন্ম কর্ম সকলই দিব্য। ইহা যিনি জানেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন, দেহান্তে আর জন্মগ্রহণ করেন না। তবে আমাকে জানিতে হইবে তত্ত্বতঃ—এই তত্ত্বতঃ জানা কথাটি কি তাহাই কিঞ্চিৎ আস্বাদন করিব।

ভগবানের অবতার-পুরুষের জন্ম এবং কর্ম সকলই দিব্য। দিব্য শব্দের অর্থ নির্দ্দেশ করিতে আচার্য্য শঙ্কর, রামানুজ, মধুসূদন সকলেই বলিয়াছেন, "দিব্যমপ্রাকৃতম্", দিব্য পদে অপ্রাকৃত বুঝাইবে। স্বামিপাদ লিখিয়াছেন, "দিব্যমলৌকিকম্"। চক্রবর্ত্তিপাদ

বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, স্বামিপাদের অলৌকিক শব্দের অর্থ ঐ অপ্রাকৃতই।

ভগবানের জন্মকর্মের ঘটনাবলী ঘটে প্রাকৃত জগতে, কিন্তু সেগুলি আসলে অপ্রাকৃত। ভগবানের জন্মকর্মকে বেদান্তশাস্ত্র ও ভাগবতশাস্ত্র "লীলা" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ভক্তেরা লীলাকে অভিনয়ের সঙ্গে তুলনা করেন।

অভিনয়টি যেখানে ঘটে, অভিনীত বিষয়বস্তুটি সেখানকার ঘটনা নয়। এক স্থানকাল-পরিবেশের বস্তু অন্য স্থানকাল-পরিবেশে তুলিয়া লইয়াই অভিনীত হয়। মেবারপতন ঘটনাটা মেবারের, চারি শত বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত, তাহা দেখিলাম অন্য কলিকাতা সহরে, শ্যামবাজারের সিনেমায়। ভগবানের জন্মকর্ম ঘটনাটি সেইরূপ মূলতঃ নিত্যলোকের নিত্যবস্তু, আমরা তাহা দর্শন করি কিছুকালের জন্য অনিত্য প্রপঞ্চে। "প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হইতে", নিত্যের বস্তুই অনিত্যে প্রকটিত। তত্ত্বতঃ জানার ইহাই প্রথম কথা।

দৈনন্দিন ঘটনাপঞ্জীর ঘটন-ভূমি একটিই। অভিনয়ের ভূমি কিন্তু দুইটি। একটি রঙ্গমঞ্চ, অপরটি নেপথ্য। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়, নেপথ্য বা বেশগৃহ হইতে অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। অভিনেতারা সেখান হইতে সাজ পরিয়া রঙ্গমঞ্চে আসেন। অভিনয়ের আনন্দ আস্বাদন করিতে ঐ দুই ভূমিরই উপযোগিতা আছে। নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যে অভিনয় দেখে সে তত্ত্বতঃ দেখে। তত্ত্বতঃ জানার ইহা দ্বিতীয় কথা। কথাটি আর একটু পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা অভিনীত হইতেছে। বহু লোকের ভিড়। ঘাটে পথে অনেক কাবুলিওয়ালা চলে, তাহা দেখিতে লোকের সংঘট্ট হয় না। সহরের অন্যান্য স্থানে কাবুলিওয়ালার অভিনয় হয়, এত জনতা হয় না। শান্তিনিকেতনের লোকেরা রবীন্দ্রনাথকে চলিতে বসিতে দেখে, তাঁহাকে দেখিতেও এত লোকের আগ্রহ নয়। লোক জমিয়াছে শুধু কাবুলিওয়ালার জন্যও নয়, শুধু রবীন্দ্রনাথের জন্যও নয়। কাবুলিওয়ালারূপী রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে জনতার আগ্রহ। কাবুলিওয়ালার সাজ লইবেন কে, ইহা জানিয়াই অর্থাৎ সাজঘরেব দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই এত দর্শকের সমাগম।

থিয়েটারের বিজ্ঞাপনদাতারা অভিনয়ের শ্রেষ্ঠাংশে কে কে থাকিবেন তাহাও বিজ্ঞাপিত করেন। দর্শকদিগকে সাজঘরের খবরটা জানাইয়া না দিলে তাহাদের আকর্ষণ হইবে না। অভিনয় দেখিব রঙ্গমঞ্চে, কিন্তু খবর জানিব সাজঘরের। সেইরূপ ভগবানের জন্মকর্ম দর্শন করিব ভূমিতে, কিন্তু তাহাতে খবর জানিব ভূমার। ঘটনা দেখিব ভূলোকে, কিন্তু তাহাতে রহস্যটি ব্যক্ত হইবে গোলোকের। ইহাই তত্ত্বতঃ জানা।

লঙ্কায় শ্রীরামচন্দ্রের সহিত রাবণ-কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ হইতেছে। এই যুদ্ধ আপনি লঙ্কাতেই দেখিতেছেন। আপনার তত্ত্বতঃ দর্শন হইতেছে না। কারণ ঐ যুদ্ধ একটি লীলাভিনয়। লঙ্কা সেই অভিনয়েই রঙ্গমঞ্চ। আপনি সেই অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চই দেখিতেছেন, সাজঘর দেখেন নাই। আপনার দর্শন অ-তত্ত্বজ্ঞের দর্শন।

যাঁহারা ঐ লীলা তত্ত্বতঃ দেখিতেছেন, তাঁহারা বলিতেছেন, লঙ্কায় যে অভিনয়ের মঞ্চ, তাহার সাজঘর বৈকুণ্ঠে। লঙ্কায় যাঁহারা শ্রীরাম, রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, সাজঘরে তাঁহারা বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীনারায়ণ ও তাঁহার দ্বারিদ্বয় জয় ও বিজয়—প্রভু ও অনুগত ভৃত্যদ্বয়। এক্ষণে সাজিয়া আসিয়াছেন পরস্পরের ঘোরতর শত্রু। বৈকুণ্ঠের সাজঘরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যে লঙ্কার রঙ্গমঞ্চ দেখিল সে-ই রামলীলাকে তত্ত্বতঃ দেখিল।

ভগবানের সিসৃক্ষা বৃত্তি জাগিলে তিনি বহু হন, সৃষ্টি করেন—একথা শ্রুতিতে আছে। লীলাবাদীরা বলেন, ভগবানে অনন্ত বৃত্তি আছে। সিসৃক্ষা জাগিলে যেমন সৃষ্টি করেন—যুযুৎসা জাগিলে তেমনই যুদ্ধ করেন। আজ জাগিয়াছে যুযুৎসা, তাই প্রিয় ভক্তকে শত্রু সাজাইয়া, নিজে রাজকুমার সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে আসিয়াছেন। এই নবীন সাজ হইল কাহার দ্বারা? যোগমায়া দ্বারা (আত্মমায়য়া)। সিসৃক্ষা জাগিলে প্রয়োজন হয় বহিরঙ্গা মায়ার সহকারিতা; লীলার সাধ জাগিলে প্রয়োজন পড়ে যোগমায়া বা আত্মমায়ার সহকারিতা। অতত্ত্বজ্ঞ দেখে একটি যুদ্ধ ঘটনা মাত্র। তাহার দেখা ঠিক হয় না। তত্ত্বজ্ঞ দেখেন একটা যুদ্ধের লীলাভিনয়—ভগবান্ যুযুৎসা-বৃত্তির পরিপূর্ত্তির ভূমিকায় বিরাজমান। এই দেখা যথার্থ। ইহার নামই "বেত্তি তত্ত্বতঃ"।

যাঁহারা শুধু যুদ্ধ দেখেন তাঁহারা ঐ কার্য্যের মধ্যে জীবশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাটি প্রধান করিয়া দেখেন, দুর্বৃত্ত রাবণ-কুম্ভকর্ণের দুঃখময় পরিণতি সাধন করিয়া গ্রন্থকার জীবকে দুর্নীতি পরিহার

করিবার কথা শিক্ষা দিতেছেন। যাঁহারা তত্ত্বতঃ দেখেন তাঁহারা জীবশিক্ষা ছাড়া আরও একটি উদ্দেশ্য দেখিতে পান। উহার মধ্যে লীলাকারীর নিজেরও একটা আনন্দের আস্বাদন আছে। কেবল শ্রোতৃবৃন্দকে সুখ দিতেই রবীন্দ্রনাথ কাবুলিওয়ালা সাজেন নাই। ঐ ভূমিকায় অভিনয় করিতে তাঁহার নিজের ভিতরেও একটি স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ আছে। এই জন্যই বলিতেছেন, অবতারের জন্মকর্ম্ম "দিব্য"। উহা একটা দিব্যোজ্জ্বল নির্ম্মল আনন্দের ক্রীড়া (দিবু ক্রীড়ায়াং), উহা আত্মক্রীড়ের ক্রীড়া। ইহা যিনি জানিলেন তিনি তত্ত্বতঃ জানিলেন।

যিনি অর্জ্জুন-সারথি, তিনি জীবমাত্রেরই জীবনরথের নিত্য সারথি। যিনি অর্জ্জুনকে গীতার উপদেশ দিতেছেন, তিনি প্রত্যেক জীবেরই অন্তরে অন্তর্য্যামী পরমাত্মরূপে থাকিয়া অন্তররাজ্য সংযমন করতঃ বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করিতেছেন। ইহা জানাই তত্ত্বতঃ জানা।

যিনি বলেন, গীতা জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার কথা মাত্র—তিনি কিন্তু তত্ত্বতঃ দেখেন না। যিনি বলেন গীতা বিশিষ্টক্ষেত্রে সংঘটিত একটি ঐতিহাসিক ঘটনা মাত্র—তিনিও তত্ত্বতঃ জানেন না। যিনি জীবাত্মা পরমাত্মার নিত্য আলাপন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রকট দেখেন তিনিই তত্ত্বতঃ দ্রষ্টা।

যিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখেন তিনি অভিনয় দেখেন না। যিনি শুধু কাবুলিওয়ালাকে দেখেন তিনিও অভিনয়ের রস পান না। যিনি কাবুলিওয়ালার মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে প্রকট দেখেন তিনি অভিনয়কে তত্ত্বতঃ দেখেন। অগণিত গুণশালী রবীন্দ্রনাথ

কাবুলিয়ালার মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়াছেন। কবি, গায়ক, বক্তা, লেখক রবীন্দ্রনাথ আজ আর কিছুই নহেন, কেবল কাবুলিওয়ালা। আনন্দ নিজে পাইতে আর অপরকে দিতে এই সাজ। ইহা যিনি জানেন তিনি তত্ত্বতঃ জানেন।

অসীম অনন্ত ব্রহ্ম পরাৎপর আজ পার্থসারথির মধ্যে ধরা পড়িয়াছেন। আজ তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয় নহেন, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণের কারণ নহেন—আজ তিনি শুধু পার্থসারথি। সীমার ফাঁদে অসীম। রূপের মধ্যে অরূপ। অনিত্যের আবরণে নিত্য। দুর্ব্বার গতির আড়ালে স্থিতির নিবিড় প্রশান্তি। ইহা জানাই তত্ত্বতঃ জানা।

তত্ত্বতঃ জানার বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলা রইল, এক্ষণে জানার প্রণালী সম্বন্ধে বলা যাইতেছে।

তত্ত্বতঃ জানার মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির একটি অপূর্ব্ব মিলন-মাধুর্য্য আছে। তত্ত্বটিকে জানিব জ্ঞানদ্বারা কিন্তু লীলাটিকে ভোগ করিব ভক্তিদ্বারা। রূপের মধ্যে অরূপ। অরূপকে জানিব জ্ঞান দ্বারা, রূপকে আদর করিব ভক্তি দ্বারা। রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে পাই না—তাঁহাকে জানিব জ্ঞানে। কাবুলিওয়ালাকে দেখিতে পাই, তাঁহার অভিনয় উপভোগ করিব ভক্তিতে—ভালবাসায়।

এই-ই রবীন্দ্রনাথ। এই স্থির জ্ঞানের ভিত্তিতে কাবুলিওয়ালার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি আসিবে। শেষে কিন্তু ভক্তির প্রবলতায় জ্ঞান স্তিমিত হইয়া পড়িবে। ধূপের কাঠিটির গন্ধ পাইবার জন্য দেশলাই জ্বালাইয়া ধরাইয়া দিই। কিন্তু জ্ঞানের অগ্নি

যদি কাঠিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে তবে আর গন্ধের ভোগ হইবে না। তাই তাড়াতাড়ি নিভাইয়া দেই। একেবারে নিভাইয়া না, অর্দ্ধস্তিমিত করিয়া রাখি। তবেই গন্ধ পাই। ইহাই জ্ঞানশূন্যা ভক্তি।

আগে জ্ঞান, তারপর জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, তারপর জ্ঞানশূন্যা ভক্তি। এই শূন্যতা অভাবের নয়—পূর্ণতার। গীতাও এই কথা কহিয়াছেন।

"ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্" (১৮।৫৫)—আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া আমাতে প্রবেশ করে। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব তাঁহার স্বভাবসুলভ মাধুর্য্যের দৃষ্টান্ত দিয়া এই কথাই বলিয়াছেন—জ্ঞান পুরুষ, ভক্তি নারী। রাজবাড়ী ভক্তিদেবী একাকিনী যাইতে পারেন না। তাই জ্ঞান তাঁহাকে দুয়ার পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসেন। তারপর পুরুষ-জ্ঞান অন্দরে যাইতে সাহসী হন না। ভক্তিদেবী তাঁহাকে সেখানে ফেলিয়া রাখিয়া অন্দরে প্রবেশ করেন। "তদনন্তরম্" অর্থ স্বামিপাদ লিখিয়াছেন, "জ্ঞানস্যাপ্যুপরমে সতি"।

গীতার জ্ঞান-কর্ম্ম-সমুচ্চয়ে আমরা দেখিতে পাই যে, যেরূপ নিখিল কর্ম্ম আসিয়া জ্ঞানে পর্য্যবসিত হয় (জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে), ঠিক সেইরূপ জ্ঞান-ভক্তির সমুচ্চয়েও সকল জ্ঞান আসিয়া ভক্তিতে পর্য্যবসান প্রাপ্ত হয় (তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে, ৭।১৭)।

কর্ম্ম যখন জ্ঞানে মিশে তখন সে আর কামীর কামনামিশ্রিত কর্ম্ম নয়। কামনার বিষদন্ত তোলা সাপুড়িয়ার সাপের মত সে

তখন জ্ঞানের কোলে খেলে। আবার জ্ঞান যখন আসিয়া ভক্তিতে পূর্ণতা লাভ করে তখন রসের মধ্যে তার নব জন্ম হয়। যেমন বিবাহের মধ্যে কুমারীর জীবনের অবসান হয়, বধূর মধ্যে নূতন জন্ম লইয়া সে বাঁচিয়া থাকে, পরাভক্তিতে মিশিয়া জ্ঞান তেমনি শূন্য হইয়া গিয়া পূর্ণভাবে বিরাজমান থাকে। পূর্ণতায় শূন্যতা, পূর্ণজ্ঞানীর অজ্ঞানতা বড় মধুর। গীতা সেই মাধুর্য্যের ইঙ্গিত দিয়াছেন।

এই লীলাভিনয়ের চরম আস্বাদন হয় :তখনই, যখন অভিনয় দেখিতে দেখিতে আপনি সাজঘরের মানুষটিকে একেবারে ভুলিয়া যাইবেন। কাবুলিওয়ালাকেই দেখিতে থাকিবেন, উনি যে রবীন্দ্রনাথ তাহা আর মনে থাকিবে না। এই ব্যাপারটি সম্ভব হয়, যদি সাজঘরের মানুষটিও অভিনয় করিতে করিতে নিজ সত্তাকে ভুলিয়া যাইতে পারেন। কাবুলিওয়ালা যদি সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাইতে পারেন যে তিনি রবীন্দ্রনাথ, তাহা হইলে সহৃদয় দর্শকের পক্ষে ঐরূপ ভুলিবার সম্ভাবনা থাকে। এ হইল একেবারে "আমি হ না জানি, না জানে গোপীগণ।" এ অনেক দূরের সংবাদ। কুরুক্ষেত্রের কথা নয়. বৃন্দাবনের কাহিনী। গীতার প্রসঙ্গ নয়, ভাগবতের আস্বাদ্য। এখনকার জন্য থাকুক।

গীতার জ্ঞানভক্তি সমুচ্চয়ের একটি বীজ ঐ "বেত্তি তত্ত্বতঃ" কথাটার মধ্যে নিহিত। সমগ্র গীতা ঐ সমুচ্চয়মুখী। কর্মকে নিয়া জ্ঞানে, জ্ঞানকে নিয়া ভক্তিতে ঢালিয়া দেওয়া। আগে কর্মকে স্থাপন, তারপর তাকে জ্ঞানে ডুবান। তারপর জ্ঞানকে স্থাপন, শেষে ভক্তিতে ডুবান। জ্ঞানকর্ম-সমুচ্চিত পূর্ণাঙ্গ কর্মকে

তুর্গোৎসবের বেদীতে বসাইয়া পূজা করিয়া তারপর "সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য" মন্ত্রে ভক্তি-গঙ্গার শরণাগতি-সঙ্গমে তাহাকে বিসর্জ্জন—নবতম মাধুর্য্যের পুনরাস্বাদনে। ইহা গীতার সমগ্ররূপ, আমরা ক্রমে দেখিব। এখন শুধু এইটুকু দেখা যে তত্ত্বতঃ জানা কথাটা কত গভীর। সমগ্র গীতা যেন ওর মধ্যে।

এইভাবে শ্রীভগবানের জন্মকর্মকে যিনি তত্ত্বতঃ জানেন তাঁহার একটা বিরাট লভ্য আছে। —"ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি", তিনি দেহত্যাগান্তে আমাকেই প্রাপ্ত হন, আর জন্মগ্রহণ করেন না। দেহান্তে ঈশ্বরলাভ ও পুনর্জন্মাভাব এই আশার সংবাদে সকল সাধকেরই আনন্দ হইবার কথা—কিন্তু এই সংবাদে পরাভক্তির সাধক তেমন খুসী হন না। কবে দেহান্ত হইবে, তারপর প্রাপ্তি—কত বিলম্ব—কত অনিশ্চয়তা—ইহা ভক্তের অসহনীয়। তাই তার জন্য শ্লোকের ব্যাখ্যান্তর "অত্র দেহং ত্যক্ত্বা ইত্যস্য আধিক্যাদেব বাচক্ষতে স্ম"—(বিশ্বনাথ)।

শ্লোকের অর্থ হইবে এইরূপ—"দেহং ত্যক্ত্বা পুনর্জ্জন্ম ন এতি, দেহম্ অত্যক্ত্বা এব মাম্ এতি" (বিশ্বনাথ)—তিনি দেহত্যাগ করিয়া পুনর্জ্জন্মগ্রহণ করেন না, দেহত্যাগ না করিয়াই আমাকে প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ এই জন্মেই এই দেহেই আমাকে লাভ করেন। আমার দিব্য জন্মকর্মের যথার্থ জ্ঞানলাভের ফলে আমাতে আশ্রয় গ্রহণ করিবার বাধক যত তুষ্কৃতি আছে, সব বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে—ফলে এই জন্মেই আমার আশ্রয়ে আমার অতি প্রিয় হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

"মদীয়-দিব্যজন্মচেষ্টিত-যথার্থজ্ঞানেন বিধ্বস্তসমস্ত-মৎসমাশ্রয়-

বিরোধিপাপ্মা অস্মিন্নেব জন্মনি মামাশ্রিত্য মদেকপ্রিয়ো মামেব প্রাপ্নোতি ইতি—শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণাঃ—(বিশ্বনাথ)।"

ভক্তও তাহাই চান। সাধন-ফলে মুক্তি হউক কিংবা কর্ম বিপাকে পশু পক্ষী মানব যে-কোন যোনিতে জন্মই হউক, ভক্ত বলেন—

"কিয়ে মানুষ পশু, পাখীকুলে জনমিয়ে,
অথবা কীট পতঙ্গে।
করম বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুনঃ,
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে॥"

শ্রীভগবানে যদি মতি হয়—ভক্তিদেবী যদি কৃপা করেন, তাহা হইলে ভক্তের আর চাওয়া থাকে না—'অপুনর্ভব'ও আদৃত হয় না। প্রাপ্তি জন্য মরণের পর পর্য্যন্ত অপেক্ষাও অসহনীয় হয়। তাই সে এই জন্মেই এই দেহেই সাক্ষাৎকার লাভে ধন্য হয়। নিজ শ্রীমুখেও আশ্বাস দিয়াছেন—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি"।

পাঁচ

"যে যথা তাংস্তথা"

স্বীয় জন্মকর্মের দিব্যত্ব কীর্ত্তন করিয়া শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিলেন যে, আমার দিব্য জন্মকর্ম যিনি তত্ত্বতঃ জানেন তাঁহার আর জন্মকর্মের বন্ধন থাকে না। কেন থাকে না, তাহা "বীতরাগ-ভয়ক্রোধাঃ" ইত্যাদি পরবর্ত্তী শ্লোকে (৪।১০) বলিতেছেন—

আমার জন্মকর্মের কথা এতই মধুর যে, সেই মাধুর্য্যের আস্বাদন পাইলে জীবের আর অন্য বিষয়ে অনুরাগ থাকে না, সে বীতরাগ হয়। "তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্ রতিঃ ক্বচিৎ" ঐ লীলারসে যিনি তৃপ্ত হইয়াছেন তাঁহার আর অন্য রসে রতি হয় না। ভাগবত বলিয়াছেন,—"ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং" তদ্ভিন্ন বস্তুর প্রতি যে আকর্ষণ তাহা একেবারে বিস্মরণ হইয়া যায়।

শ্রীভগবানের জন্মকর্মের কথা জানিলে কেবল যে চিত্ত মাধুর্য্য-মগ্ন হয় তাহাই নহে, জ্ঞান ও কর্মও সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয়। শ্রীভগবান্ অজ, অব্যয়, অব্যক্ত হইয়াও কিরূপে যে আত্মমায়া দ্বারা অবতীর্ণ হন এই তত্ত্বই পরম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। এই তত্ত্বের জ্ঞানলাভে জীব "অভয়-ভূমি" প্রাপ্ত হয়, দ্বিতীয়াভিনিবেশজ ভয় তার আর থাকে না।

শ্রীভগবান্ নিষ্ক্রিয় ও অকর্ত্তা হইয়াও যেমনভাবে কর্ম করেন তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্মতত্ত্ব। অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "অর্জ্জুন, আমার কোন কর্ত্তব্য নাই তবু কর্ম করি।" ইহাই গীতোক্ত দিব্য

কর্মতত্ত্ব। এই তত্ত্বের মূর্ত্ত আদর্শ-পুরুষ তিনিই। সুতরাং তাঁহার তত্ত্বানুভবে কর্ম নির্দ্দোষ হইয়া যায়।

কর্ম যাঁর নির্দ্দোষ অর্থাৎ কামনাহীন, তিনিই কামশূন্য হন। কাম না থাকিলে ক্রোধের চির নির্ব্বাপণ হয়। "কামাৎ ক্রোধঃ" —কাম্যবস্তু প্রাপ্তির পক্ষে যে বাধক তার উপর ক্রোধ হইবে। কাম না থাকিলে ক্রোধের আবাস উচ্ছিন্ন হইল। কামগন্ধহীন ব্যক্তিই অক্রোধ-পরমানন্দ। সুতরাং শ্রীভগবানের জন্মকর্মের তত্ত্বতঃ অনুভবকারী ব্যক্তি বীতরাগভয়ক্রোধ হইয়া থাকেন।

আমা ভিন্ন ইতর বস্তুতে রাগ না থাকিলে সে আমাকে সর্ব্বাশ্রয় জানিয়া আশ্রয় করতঃ "মামুপাশ্রিত" হইবে। অধ্যাত্ম-জ্ঞানোদয়ে "জ্ঞানতপসা পূত" হইবে। "মন্মনা" হইয়া মদেকচিত্ত-বিশিষ্ট হইবে। এইরূপ হইয়াই "মদ্ভাবমাগতাঃ" হইবে—আমার ভাব বা প্রকৃতি লাভ করিবে। আমি তো জন্মকর্মের অতীত—আমার ভাব যে পাইবে তার আর জন্মকর্মের বন্ধন থাকিবে কেমন করিয়া? আমি যেমন জন্মকর্মের অতীত হইয়াও দিব্য জন্মগ্রহণ করিয়া দিব্য কর্ম করি—মদ্ভাবাপন্ন ভক্তও সেইরূপ আমার পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার ইচ্ছায় লীলার সঙ্গী হইয়া দিব্য জন্মগ্রহণ ও কল্যাণময় কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। (তান্ স্বপার্ষদীকৃত্য তৈঃ সার্দ্ধমেব যথাসময়মবতরন্নন্তর্দ্দধানশ্চ তান্ প্রতিক্ষণমনুগৃহ্লন্নেব তদ্ভজনফলং প্রেমাণং দদামি)—বিশ্বনাথ। অর্থাৎ—তাহাদিগকে স্বীয় পার্ষদ করিয়া তাহাদিগের সহিতই যথাসময়ে অবতীর্ণ এবং অন্তর্হিত হইয়া থাকি, এবং অনুগ্রহ করিয়া প্রেমরূপ ভজনফল প্রদান করি।

"মদ্ভাব" শব্দের তাৎপর্য্য নির্ণয়ে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"মদ্ভাব"—"মোক্ষ"। শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন,—"মদ্ভাব" অর্থ "মৎ-সাযুজ্য"। শ্রীবলদেব বলিয়াছেন—""মৎসাক্ষাৎকার"। শ্রীমধুসূদন বলিয়াছেন—"আমাতে রতি"। পূর্ব্ববর্ত্তী (৪।৯) শ্লোকে "মামেতি" ও পরবর্ত্তী (৪।১০) শ্লোকের "মদ্ভাবমাগতাঃ" একই কথা। প্রথমে সামান্যতঃ নির্দ্দেশ, পরে বিশেষ নির্দ্দেশমাত্র।

নবম শ্লোকের কথাটাই দশম শ্লোকে পূর্ণ করিয়া বুঝাইলেন। লীলাতত্ত্বের অনুধ্যান একটি নিরুপম সাধন-সম্পদ্। ভাগবতে শ্রীশুক বলিয়াছেন—"ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ"—আবির্ভূত হইয়া এমন মধুর লীলাই করেন, যাহা শ্রবণগত হইলেই চিত্ত তদনুপ্রাণিত হইয়া পড়ে। শ্রীলীলাবিগ্রহ অবলম্বনে ভজনে মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা ব্যক্ত হয়। ঐ ভজনে জীব পূত হয়। হৃদ্রোগ কাম থাকে না। কন্দর্পমোহনের লীলানুধ্যানে কান্দর্পিক বিকার চিরবিদূরিত হয়। তাই সাধক জ্ঞানতপসাপূত হইয়া যায়।

এই লীলাধ্যানের পথ প্রধানতঃ ভক্তিমার্গ। এখন একটি প্রশ্ন মনে জাগে। সংসারে সকলেই ভক্তিমার্গে ভজন করেন না। জ্ঞানের পথ, কর্মের পথ, যোগের পথ, দেবতাদি অর্চ্চনার পথ, নানা পথ আছে। ভক্তিমার্গী সকলেই যে লীলাধ্যান করেন, এমনও কোন কথা নয়।

কেহ বা ভগবদবতারে বিশ্বাস করেন, কেহ বা করেন না। কেহ বা অবতারে বিশ্বাস করেন কিন্তু অবতারের জন্মকর্মের নিত্যত্ব মানেন না। কেহ সাকার ভাবেন, কেহ নিরাকার ভাবেন, কেহ

সগুণ ভাবেন, কেহ নির্গুণ ভাবেন। কত শত প্রকার ভজনধারা জগতে প্রবর্ত্তিত আছে। যাঁহারা ভক্তিপথে লীলাতত্ত্বের ধ্যান করেন তাঁহাদের কথা বলা হইল; যাঁহারা তাহা করেন না, মানেন না, বোঝেন না, বিশ্বাস করেন না, অন্যমতে, অন্যপথে চলেন, তাঁহাদের কী গতি হয়? এই আশঙ্কার উত্তর দিতেছেন।

উত্তরটি অভিনব। উত্তরে এমন একটি অপূর্ব্ব সন্দেশ পরিবেশন করিয়াছেন, যাহার মত বিশ্বজনীন উদার মহাবাক্য বিশ্ব-সাহিত্যে আর কোথাও উচ্চারিত হয় নাই। সনাতন ধর্মের চরমতম ঔদার্য্যের তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিয়া কহিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" শ্রীভগবান্ বলিলেন—"অর্জ্জুন, যে যেভাবে আমাকে ভজনা করে, তাহাকে সেই ভাবেই আমি অনুগ্রহ করি।" যে সাকার ভাবে, সে সাকারই দেখে। যে নিরাকার ভাবে, সে নিরাকারই অনুভব করে। যে নির্গুণ, নিঃশক্তিক, নির্ব্বিশেষ সত্তা ভজনা করে, সে তাতেই লয়প্রাপ্ত হয়। যে অশেষ কল্যাণগুণময় কৃপাসমুদ্র চিরসুন্দর ক্ষমাসুন্দরস্বরূপ ভাবনা করে, সে তাঁহারই দর্শন পাইয়া সেবানন্দে তন্ময় হয়। যে স্বর্গসুখ চায় সে তাহাই পায়। যে মুক্তিসুখ চায় সে তাহাই পায়। যে সেবাসুখ চায় তাহার তাহাই প্রাপ্তি ঘটে। অদ্বৈতবাদী নির্ব্বাণ পায়। যোগী কৈবল্য লাভ করে। ঐশ্বর্য্যমার্গের ভক্ত বৈকুণ্ঠে যায়। মাধুর্য্যের সাধক নিত্য সেবানন্দে ডুবিয়া রহে।

এইরূপ হইবার কারণ শ্রীভগবানের পরমোদার স্বভাব।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ ঐ শ্লোকের অনুবাদে লিখিয়াছেন —

"আমাকে ত যে-যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে-সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥"

(চরিতামৃত, আদি-৪র্থ)

অগ্নির দাহনকার্য স্বরূপসিদ্ধ, স্বধর্ম। সে ভাবের কখনও অন্যথা হইতে পারে না। শ্রীভগবানেরও সেইরূপ স্বরূপসিদ্ধ স্বভাব এই যে, তিনি সাধকের ভজনানুরূপ ভজন করিয়া থাকেন। শ্লোকে আছে, "তাংস্তথৈব"। গীতার টীকাকার শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণ 'এব' শব্দটির তাৎপর্য্য বুঝাইতে লিখিয়াছেন— "ন্যূনতামেবকারো নিবর্ত্তয়তি", অর্থাৎ 'এব' শব্দটি বুঝাইতেছে যে, ভক্তের ভাবের জাতি ও পরিমাণ অপেক্ষা আমার (ভগবানের) অনুগ্রহের প্রকার ও গভীরতা বিন্দুমাত্র ন্যূন হয় না।

ইহা দ্বারা বোঝা গেল যে, ভগবান্ বহুরূপী ও বহুভাবাবলম্বী, এবং তৎপ্রাপ্তির উপাসনামার্গও বহুবিধ বিদ্যমান আছে। প্রত্যেক মার্গেই ভজন নির্দ্দোষ হইলে ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটিতে পারে। তাহাই বলিতেছেন যে, সংসারে সকল মনুষ্যই আমার বর্ত্ম অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে জীবমাত্রই তাঁহার অভিমুখে চলিতেছে ("যৎ প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি"—শ্রুতি), তাঁহার দিকে সবাই ধায় বলিয়াই তো তিনি ব্রহ্মবস্তু। সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ। আনন্দপিয়াসী জীবকুল অনাদি-কাল ধরিয়াই আনন্দঘন-বিগ্রহ তাঁহার চরণাভিমুখে ছুটিয়াছে। ভগবদ্ভক্তির এই পরমোদার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইলে অন্তর হইতে

ধর্মগত পার্থক্য বা ধর্মবিদ্বেষ চিরতরে লুপ্ত হয়। এই শ্লোক মানবের কণ্ঠহার হইলে মানবসমাজের একপরিবারত্বের বোধ হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে।

শ্লোকটি কি সুন্দর! ভক্ত ভজন করেন। ভগবান্ বলিলেন, আমিও ভজন করি। ভক্তের ভজন হইল—আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন। ভগবানের ভজন হইল—ভক্তের অপেক্ষিত আকাঙ্ক্ষিত আস্বাদন দ্বারা অনুগৃহীত করা। ভজনানুরূপ ভজন করা শ্রীভগবৎস্বরূপের এক অসাধারণ ধর্ম। এই ধর্মের মূলে আছে তাঁহার অসাধারণ কৃপাশক্তি।

এই কৃপাশক্তিতে তিনি নিয়ত ভরপুর আছেন। দুগ্ধ যেমন দধি হইবার অপেক্ষাতেই আছে, ভগবান্‌ও সেইরূপ ভক্তের ভজনানুকূল ভজন করিতে তৈয়ারী হইয়াই আছেন। দুগ্ধে অম্ল দিলেই দধি হয়। ভক্ত ভগবানের ভজন করিলেই ভজনানুকূল্য লাভ হয়। দুগ্ধের দধিরূপে পরিণত হইবার স্বভাব আছে, কিন্তু অম্ল-সংযোগ না করিলে তাহা হয় না। শ্রীভগবানেরও ভক্তসাধকের আবেশানুরূপ ভজন করিবার স্বভাব আছে, কিন্তু ভজনশক্তির সাহায্য না পাইলে উহা সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়া উঠে না। ভক্তের ভজন তাহা অভিব্যক্ত হইবার সুযোগ দেয়। তাই তো ভক্ত এত প্রিয়।

দুগ্ধে অম্ল দিলে দধি হয়, জল দিলে কিন্তু হয় না। শ্রীভগবান্‌কে ভজনা করিলেই ভাবানুরূপ অনুগ্রহ করেন। বিনশ্বর বিষয়-সম্পদ্‌কে ভজন করিলে ফল পাওয়া যায় না—পদে পদে নৈরাশ্যের আঘাত আসিয়া বিষয়াসক্ত জীবকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে।

"বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন,
চপল সুখ লব লাগি রে।"

—"যে যথা মাং" শ্লোকটি একটি রত্নের খনি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যপাদগণ এই আকর হইতে কত না মহারত্ন আহরণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, ভজনানুরূপ ভজন করিব ইহা কৃষ্ণের একটি প্রতিজ্ঞা-বাক্য। এ বাক্য অনাদি সত্য। এ প্রতিজ্ঞা কদাপি লঙ্ঘিত হয় না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! একটিমাত্র স্থানে ঐ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। সত্যসংকল্পের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ! বিস্ময়ের কথাই বটে।

"কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখ বচনে॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

—সত্যসত্যই শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলায় একটি শ্লোক আছে যাহাতে ঐ প্রতিজ্ঞাভঙ্গের স্বীকারোক্তি নিজ শ্রীমুখেই করিয়াছেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩২।২২)

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল কেন? গোপিকার ভজন এমনই একটি উন্নত ভূমিকায় অধিরূঢ় যে, তাহাতে "যে তথা তাংস্তথা" প্রতিজ্ঞা-বাক্য রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব হইয়া পড়ে। গীতার যেটি শেষ কথা, সেই "সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য" (১৮।৬৬) মন্ত্রের ভূমিতে ব্রজগোপিকারা স্থিত। গৌড়ীয় আচার্যেরা বলিতে চাহেন যে, গীতার "সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোক ও "যে যথা

মাং" শ্লোক এই দুইয়ের মধ্যে চরমে একটা বিরোধিতা আছে। এই বিরোধিতা ধরা পড়িল গোপীর ভজনে।

সত্যসত্যই কেহ যদি সর্ব্বধর্ম্ম ছাড়িয়া, গোপীর মত, একমাত্র শ্রীভগবানেরই শরণাগত হয়, তাহা হইলে শ্রীভগবান্‌কেও প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ সব ছাড়িয়া সেই ভক্তকে ভজিতে হয়। ভক্ত যেমন একমাত্র ভগবান্‌কেই ভাবে, ভগবান্‌কেও সেইরূপ ভক্তকেই ভাবিতে হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহা পারেন না। কেন না, তাঁহার মন নিখিল ভক্ততে আছে। তিনি নিজ চিত্তকে বহু ভক্তজনে প্রেমযুক্ত করিয়াছেন। কাজেই গোপিকার ভজনে প্রতিজ্ঞা বাক্য ব্যর্থ হইয়া যায়। প্রতিজ্ঞাভঙ্গে প্রতিজ্ঞাকারী ঋণগ্রস্ত হন। ঋণ শোধিতে বিশ্বসম্রাট্ নদীয়ার পথে ফকির হইয়া বেড়ান।

এই শ্লোকে গৌরলীলার দ্রষ্টা ঋষিগণ প্রেমদাতার লীলার বীজ প্রসুপ্ত দেখিতে পান। এই শ্লোকে সাধক, ভক্ত, হীন, পতিত জীবমাত্র একটা পরম আশ্বাসের বাণী পায়। এই শ্লোক সর্ব্বপ্রকার বিদ্বেষ ও ক্ষুদ্রতা দূর করে। শ্রুতির "বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্" বাণী সার্থক হয়।

এই পরম শ্লোকের ভিত্তিতেই ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের "যত মত তত পথ" বাণী সর্ব ধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করে। এই পরম মন্ত্রের ভিত্তিতেই "আমি সকলের, সকলে আমার, পৃথিবীর সকলকে আপন করিয়া লও" এই মহাবাণী ঘোষণা করিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর স্বীয় জগদ্বন্ধু নামের সার্থকতা সাধন করেন।

রসে গম্ভীর, তত্ত্বে উদার, কারুণ্যে জাহ্নবীধারার মতো এই শ্রীকৃষ্ণকণ্ঠোক্ত "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" মহামন্ত্র জয়যুক্ত হউক।

ছয়

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্"

শ্রীগীতার তৃতীয় অধ্যায়ের শেষের দিকে বক্তা শ্রীভগবান্ "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ" (৩।৩৫) ইত্যাদি শ্লোকে স্বধর্ম্মের কথা বলিতেছিলেন। কথাটা বলা হইতে না হইতেই অর্জ্জুন এক প্রশ্ন করিয়া বসিলেন—কে বলপূর্ব্বক পাপকর্ম্মে আমাদিগকে প্রযুক্ত করে? প্রশ্নের উত্তরে তৃতীয় অধ্যায় শেষ হয়। চতুর্থ অধ্যায় আরম্ভ হইতেই অর্জ্জুনের আবার জিজ্ঞাসা। তাহার উত্তরে আসে অবতারবাদ প্রসঙ্গ। সেই প্রসঙ্গ শেষ করিয়াই বক্তা তৃতীয় অধ্যায়ের শেষের দিক্‌কার যে কথা বলিতে বলিতে বাধা পড়িয়াছিল সেই কথা তুলিলেন,—স্বধর্ম্মের কথা। স্বধর্ম্মের মূলে হইল বর্ণবিভাগ। ভগবান্ বর্ণবিভাগের কথা আনিলেন—

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥"

—চারি বর্ণের প্রসঙ্গ গীতার নানাস্থানে ছড়ান আছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে অনেক কথা আছে। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়-তনয়। যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। তাঁহাকে যুদ্ধ করাইতে হইবে ইহা যখন বক্তার প্রধান লক্ষ্য, তখন চতুর্বর্ণের আলোচনা যে গ্রন্থের একটা প্রধান অংশ অধিকার করিয়া থাকিবে ইহা স্বাভাবিকই।

বর্ণভেদ লইয়া আর্যশাস্ত্রে বিস্তর বিচার আছে, তবে বহু মতমতান্তর নাই। শাস্ত্রকারগণের সুচিন্তিত অভিমতটি কি, সে বিষয়ে দিগ্‌দর্শনের চেষ্টা করা যাইতেছে।

ঋগ্বেদ-সংহিতায় একটি বিশিষ্ট মন্ত্রে (১০।৯০।১২) বলা হইয়াছে যে, পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও চরণ হইতে শূদ্র জন্মিয়াছে। কথার তাৎপর্য্য এইরূপ মনে হয় যে, মানবদেহে মুখ, বাহু, উরু ও চরণের যেমন যেমন কার্য, মানবসমাজের গণদেবতার দেহে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়ের তেমন তেমন স্থান ও কার্য। বেদের এই মন্ত্রকে লক্ষ্য করিয়াই গীতার "ময়া সৃষ্টং"—আমাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, এই উক্তি শ্রীভগবানের কণ্ঠে। মুখ উচ্চাঙ্গ, চরণ নিম্নাঙ্গ এই হেতু ব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণ, শূদ্র নিম্নবর্ণ এইরূপ সিদ্ধান্ত শোভন নহে। গঙ্গা শ্রীভগবানের পাদোদ্ভবা, তাহাতে স্নানাবগাহন করিয়া মুখোদ্ভব ব্রাহ্মণও কি কৃতকৃতার্থ হন না ?

দেহের বিভিন্ন অঙ্গের বিভিন্ন কার্য, সব মিলিয়া দেহের স্বাস্থ্য। যে কোন অঙ্গবৈকল্যেই দেহ ব্যাধিগ্রস্ত। তবে মুখে আর হাতে কি কোন তারতম্য নাই ? আছে নিশ্চয়ই, গুণ কর্ম্ম বিভাগানুসারে। ভগবান্ বলিয়াছেন, আমি সৃষ্টি করিয়াছি। তিনি তো সমদর্শী। তাঁহার সৃষ্টিতে তারতম্য ঘটিবে কেন ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"আমি কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা"।

স্কুলশিক্ষক ছাত্রগণকে দশটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। ভাগ করিবার কর্ত্তা হইলেও এই ভাগের জন্য মূলতঃ শিক্ষক দায়ী নহেন। দায়ী হইল ছাত্রগণের যোগ্যতা। যে যে-শ্রেণীর যোগ্য সে সেই শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শিক্ষকের দ্বারা বিভক্ত হইলেও মূল কর্ত্তৃত্ব হইল "স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ" (১৮।৪১)।

ছাত্র হিসাবে সকল ছাত্রই সমান, যেন অভিন্ন। যোগ্যতা বিচারে তাহারা ভিন্ন বা ভেদবিশিষ্ট। এই গুণ এবং কর্ম্ম কি তাহা অনুধাবন করা যাইতেছে।

স্বভাব বা প্রকৃতির মধ্যে তিনটি গুণ আছে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। সত্ত্বগুণ-প্রাধান্যে প্রকৃতির সত্তাসাগর হইতে যে মনুষ্য-তরঙ্গটি আত্মপ্রকাশ করে, সেটি হইল ব্রাহ্মণ। তাহার স্বভাবজ কর্ম্ম হইল শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্যবুদ্ধি (১৮।৪২)। শম—অন্তরিন্দ্রিয়-সংযম। দম—বহিরিন্দ্রিয়-সংযম। তপঃ—সপ্তদশ অধ্যায়ে কথিত কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা (১৭।১৪-১৬)। শৌচ—অন্তঃকরণ ও বাহিরের শুদ্ধি। ক্ষমা—অনাদৃত বা তিরস্কৃত হইয়াও ক্রোধ নিরোধে সামর্থ্য। আর্জব—ব্যবহারের সরলতা। জ্ঞান—শাস্ত্রার্থ উপলব্ধি। বিজ্ঞান—তত্ত্বানুভূতি। আস্তিক্য—সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা। সত্ত্বপ্রাধান্যে এই নববিধ কর্ম্ম ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক। ক্ষত্রিয়াদির নৈমিত্তিক।

সত্ত্বগুণের গৌণাধিকারে ও রজোগুণের মুখ্যাধিকারে প্রকৃতির সত্তাসমুদ্র হইতে যে মনুষ্য উত্থিত হয়, সে ক্ষত্রিয়। তাহার কর্ম্ম হইল শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দাক্ষ্য, অপলায়ন, দান ও ঈশ্বরভাব (১৮।৪৩)। বলবান্ ব্যক্তিকেও আঘাত করিবার প্রবৃত্তি ও পরাক্রমই শৌর্য্য। পরাভূত না হইবার শক্তিই তেজ। বিপদেও চিত্তের অবিচলিতাবস্থাই ধৃতি। ক্ষিপ্র কার্য্য-সাধন শক্তিই দাক্ষ্য। বারংবার পরাভূত হইয়াও অপরাঙ্‌মুখতাই অপলায়ন। মূল্যবান্ দ্রব্যাদি অসংকোচে সৎপাত্রে অর্পণই দান। পালনার্থ

অনুগত জনের উপর প্রভুত্ব প্রকাশই ঈশ্বরভাব। ক্ষত্রিয়ের এই সব কর্ম্ম স্বাভাবিক।

তমোগুণের গৌণাধিকার ও রজোগুণের মুখ্যাধিকার হইলে বৈশ্যবর্ণ মনুষ্য জন্মে। তাহার কর্ম্ম হয় কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য। তমোগুণের মুখ্যাধিকারে যে মনুষ্য জন্মে, সে হয় শূদ্র। সেবা করা তাহার স্বভাবজ কর্ম্ম (১৮।৪৪)। সেবা বলিতে যে পদসেবা বুঝিতে হইবে এমন কিছু নয়। শূদ্র ব্রাহ্মণাদির ক্রীতদাস নহে। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের মধ্যে যে সম্বন্ধ ও সদ্ভাব, ব্রাহ্মণ শূদ্রের সেইরূপ ভাব থাকিবে। ব্রাহ্মণের তপস্যায়, ক্ষত্রিয়ের রাজ্যপালনে, বৈশ্যের কৃষিবাণিজ্যে সহায়তা করাই সেবা। ইহা শরীরের দ্বারা, মনের দ্বারা যে কোন ভাবেই হইতে পারে। গুণ ও কর্ম্মের তারতম্যেই উচ্চ ও নীচ শব্দের প্রয়োগ। কনিষ্ঠ ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির উপদেশ পালন করিলে কল্যাণের পথই উন্মুক্ত হয়। ধর্ম্মহীন ব্যক্তি ধর্ম্মশীল মহতের সঙ্গ করিলে ও তাঁহার শুশ্রূষা করিলে নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারে। নিম্নবর্ণও সেইরূপ উচ্চবর্ণের সঙ্গ, সেবা ও আজ্ঞাপালনে লাভবান্ হইবেন।

অতঃপর কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মতর বিচার প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে দেবর্ষি নারদ বলিতেছেন—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

(৭।১১।৩৫)

—মানুষের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে সব লক্ষণ কথিত হইয়াছে, বর্ণান্তরেও যদি তাহা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই লক্ষণ দ্বারাই বর্ণ নির্দ্দেশ

করিতে হইবে। শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় লিখিলেন,—"তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দিশেৎ নতু জাতিনিমিত্তেন ইত্যর্থঃ"।

মহাভারতের বনপর্ব্বে অজগর ও যুধিষ্ঠির সংবাদ আছে। অজগরের জিজ্ঞাসায় যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণের লক্ষণ বলিলেন। শুনিয়া অজগর প্রশ্ন করিলেন—"ধর্মরাজ, যদি ঐ সকল লক্ষণ শূদ্রে দেখা যায় ও ব্রাহ্মণে না দেখা যায় তখন কি উপায় হইবে?" যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, "ঐ সকল লক্ষণ শূদ্রে থাকিলে সে শূদ্র নয়। ব্রাহ্মণে না থাকিলে সে ব্রাহ্মণ নয়।" অজগর আবার প্রশ্ন তুলিলেন, "ধর্মরাজ, যদি বৃত্তি দ্বারাই বর্ণ ঠিক হইবে, তাহা হইলে জাতি কোন্ কাজে লাগিবে?" যুধিষ্ঠির বলিলেন, "হে অজগর! জগতে জাতি পবিত্র থাকে না। সকলেই সঙ্কর। সুতরাং শীলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

মহাত্মা মনু বলিয়াছেন, "যাঁহারা দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা যদি বেদাধ্যয়ন না করিয়া অসৎপথে চলেন, তবে তাঁহারা সবংশে সত্বর শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।" "শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ম্।"

মহর্ষি অত্রি স্বকীয় সংহিতায় ব্রাহ্মণকে দশ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—দেবব্রাহ্মণ, মুনিব্রাহ্মণ, দ্বিজব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণ, বৈশ্যব্রাহ্মণ, শূদ্রব্রাহ্মণ, নিষাদব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছব্রাহ্মণ, চণ্ডালব্রাহ্মণ, পশুব্রাহ্মণ। মহর্ষি ইঁহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ বলিয়াছেন (অত্রি-৩৬৪)।

যে ব্রাহ্মণ যথাবিধি স্নান, সন্ধ্যা, উপাসনা, গায়ত্রীজপ, হোম, অতিথিসংকার, দেবতাপূজনাদি কর্ম নিয়মিত অনুষ্ঠান করেন, তিনি

দেব-ব্রাহ্মণ। যিনি উপরোক্ত গুণসম্পন্ন হইয়া বিশেষতঃ শাক, পত্র ফলমূলাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করতঃ বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন (বনবাসে সদা রতঃ), তিনি মুনিব্রাহ্মণ। যিনি দেবব্রাহ্মণের লক্ষণযুক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার বিষয়সঙ্গ ত্যাগ করতঃ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া বেদান্তপাঠ ও সাংখ্যযোগ বিচার করেন (সাংখ্যযোগ-বিচারস্থঃ), তিনি দ্বিজব্রাহ্মণ (অত্রি ৩৬৫—৩৬৭)।

যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে ধনুক ধরিয়া বিপক্ষকে আঘাত করেন তিনি ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণ। যিনি বৈশ্যোচিত কৃষি, গো-পালন ও বাণিজ্য (বাণিজ্যব্যবসায়শ্চ) করেন, তিনি বৈশ্যব্রাহ্মণ। যিনি লাক্ষা, লবণমিশ্রিত দ্রব্য, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, মৎস্য, মাংস বিক্রয় করেন (বিক্রেতা মধুমাংসানাং), তিনি শূদ্রব্রাহ্মণ। যে ব্রাহ্মণ পরস্বাপহারক, উৎকোচ গ্রহণে তৎপর (তস্কর), ঈর্ষা অসূয়াযুক্ত (সূচক), পরের অপকারী (দংশক), মৎস্য মাংসে লোলুপ (মৎস্যমাংসে সদা লুব্ধঃ), তিনি নিষাদব্রাহ্মণ। যে ব্রাহ্মণ বৈদিক ক্রিয়াহীন সর্ব্বধর্মবিবর্জ্জিত নিষ্ঠুর, তিনি চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ। যে-ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব কিছুই নাই কেবল যজ্ঞোপবীতটি সম্বল—তাহা দেখাইয়া আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব্ব করিয়া বেড়ান (ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ), পাপহেতু তিনি পশুব্রাহ্মণ পদবাচ্য (৩৬৮—৩৭৪)।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে আপাততঃ এরূপ মনে হয় যে, বর্ণবিচারে গুণ কর্মাদিই নির্ণায়ক, জাতি বা জন্ম সংস্কারাদি একেবারে মূল্যহীন। আচার্যগণের অভিপ্রায় কিন্তু ঠিক এরূপ নহে। যদিও শ্লোকে গুণকর্মের বিভাগের কথাই উল্লেখ আছে

জন্মাদির কথা কিছুই নাই, তথাপি গুণকর্মাদি যে জন্মেরও নিয়ামক তাহা ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগভ্রষ্ট-প্রকরণে অর্জ্জুনের প্রশ্নে ভগবদুক্তি-বিচারে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। যদ্ যদ্ গুণান্বিত ব্যক্তি তৎ তদ্ গুণবিশিষ্ট পিতৃ, মাতৃ, ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করে ইহা ভগবানেরও অভিমত—যুক্তিবিচার-সঙ্গতও।

মহর্ষি অত্রির বাক্য হইতে জানা গেল যে, আচারভ্রষ্টতা হেতু ব্রাহ্মণকুমার শূদ্র-ব্রাহ্মণ, নিষাদ-ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ ইত্যাদি সকলই হইতে পারেন। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ শব্দ উল্লেখ থাকায় ঋষির অভিপ্রায় এই বুঝিতে হইবে যে, শূদ্র বা নিষাদ বা চণ্ডালতুল্য হইলেও জন্মবশতঃ যে ব্রাহ্মণত্ব তাহা একান্ত নষ্ট হইবে না। জন্ম, উপনয়ন, বিবাহাদি দশসংস্কারে তাহার ব্রাহ্মণত্ব রহিবে। তদ্রূপ শূদ্রও ব্রাহ্মণতুল্য হইবে—শ্রদ্ধায়, সমাদরে, সম্মানে ও বিভিন্ন অধিকারে। শুধু সামাজিক দশবিধ সংস্কারে শূদ্র বলিয়াই গণ্য থাকিবে। ব্রাহ্মণের শূদ্রত্ব বা শূদ্রের ব্রাহ্মণত্ব ব্যক্তিবিশেষেই সম্ভব, পরিবারগত ভাবে হইবে না বা প্রত্যেক দিনও ঘটিবে না। ব্যক্তিবিশেষের জন্য ও সাময়িক ঘটনার জন্য সাধারণ বিধির ব্যতিক্রম স্বীকার করিয়া জন্মসংস্কারাদি উপেক্ষা করিলে সমাজবন্ধন শিথিল হইতে পারে—ইহা কোন কোন আচার্যের অভিপ্রায়।

বিবাহ-সংস্কার সম্বন্ধে আচার্যদের অসবর্ণ বিবাহে স্বীকৃতি দৃষ্ট হয়। অসবর্ণ বিবাহ দ্বিবিধ, অনুলোম ও বিলোম। অনুলোম শাস্ত্রসম্মত। পিতা অপেক্ষা মাতা নিম্নবর্ণা এমত বিবাহ বিধিসম্মত। এতদ্বিপরীত নিষিদ্ধ। পিতামাতা উভয়েই

ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইতে জাত পুত্রকে 'সজাতিজ' পুত্র বলা হইয়াছে। অনুলোম বিধিতে ব্রাহ্মণ-পিতা ক্ষত্রিয়-মাতার সন্তান মূর্দ্ধাবসিক্ত, ক্ষত্রিয়-পিতা বৈশ্য-মাতার সন্তান মাহিষ্য এবং ব্রাহ্মণ-পিতা বৈশ্য-মাতার সন্তান অম্বষ্ঠ; এই তিন পুত্রকে, 'অনন্তরজ' পুত্র বলা হইয়াছে। তিন 'সজাতিজ' ও তিন 'অনন্তরজ' এই ছয় পুত্রই দ্বিজধর্মী হইবে ও উপনয়নাদি সংস্কার গ্রহণ করিবে।

"সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।" (মনু)

আচরণের দ্বারা যোগ্য হইলে শাস্ত্রকার কাহাকেও কোন অধিকারে বঞ্চিত করেন নাই। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে (১৮৮।১০-১৪) মহর্ষি ভৃগু বলিতেছেন,—সমস্ত জগতেই ব্রাহ্মণ-জাতি পূর্ণ। মানবগণ পূর্ব্বে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট হইয়া কর্মহেতু বিভিন্ন বর্ণে পরিণত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ কর্ম দ্বারাই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ লাভ করিয়াছেন। সুতরাং সকল বর্ণেরই ধর্ম ও যজ্ঞক্রিয়ায় অধিকার নিত্য বিদ্যমান আছে।

সাধারণ বিধানে স্ত্রীশূদ্রাদির কোন কোন কার্য্যে অনধিকার প্রসঙ্গ থাকিলেও বিশেষ ক্ষেত্রে গার্গী, মৈত্রেয়ী, বিদুর, সুত প্রভৃতির বেদশাস্ত্রে কিংবা সন্ন্যাসাশ্রমে কোথাও কোন অধিকারের সংকোচ দৃষ্ট হয় না।

উপনয়ন বিবাহ সংস্কারাদির যথেচ্ছতা দ্বারা নিম্নবর্ণ উচ্চবর্ণ হইবে না। গুণ ও কর্মের পরিবর্ত্তন দ্বারাই উহা হইতে পারে। উচ্চবর্ণে আরোহণেচ্ছু ব্যক্তির গুণকর্মাদির উন্নতি সাধনই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। রজস্তমোময়ী চিত্তবৃত্তিকে সত্ত্ব-গুণময়ী

করিতে পারিলে তাহার উচ্চাধিকার স্বতঃই স্বীকৃত। অহিংসা, অস্তেয়, শৌচ, সংযম, সত্য এই পঞ্চবিধ ধর্মকে মানবধর্ম বলা হইয়াছে। ইহা চতুর্বর্ণেরই পালনীয় বলিয়া মনু ব্যবস্থা দিয়াছেন। গৃহস্থমাত্রই পঞ্চমহাযজ্ঞের অধিকারী। বৈরাগ্যবান্ মাত্রই সন্ন্যাসের অধিকারী। মানব হইয়া মানবোচিত গুণ লাভের জন্য, গৃহস্থ হইয়া তদুচিত গুণসম্পন্ন হইবার জন্য সকলেই চেষ্টা থাকা বাঞ্ছনীয়। উচ্চকে নীচে নামাইয়া নহে, নীচকে উচ্চভূমিতে তুলিয়াই সমতা আনিতে হইবে।

যেখানে মানবসমাজ আছে সেখানেই চারি বর্ণের ভেদ আছে। ঐ ভেদানুসারে সমাজ শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিলে কল্যাণ হইবে। বিশৃঙ্খলা থাকিলে অকল্যাণ হইবে। উহা মনুর কথা। বর্ত্তমানকালেও সমাজে কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা সমাজের বিধি বা আইন প্রণয়ন করেন (লেজিস্‌লেটিভ্)। তাঁহারা ব্রাহ্মণ স্থানীয়। যদি তাঁহারা সকলে ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন হন তাহা হইলে সমাজ কল্যাণের পথে চলিবেই। অন্যথায় কুফল ফলিবে। যাঁহারা সমাজের কার্যকরীশক্তি বা শাসনশক্তি (এক্‌জিকিউটিভ্ বা এড্‌মিনিষ্ট্রেটিভ্) তাঁহারা যদি ক্ষত্রিয়গুণোপেত হন তাহা হইলে ঐ কার্য সুষ্ঠু হইবে। অন্যথা ফল শুভ হইবে না।

বর্ত্তমানে, আমেরিকায় সমাজ-বিজ্ঞানীদের (সোসিওলজিষ্ট) মধ্যে সুনিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থার (প্ল্যাণ্ড সোসাইটি) জন্য গভীর গবেষণা চলিতেছে। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতন্ত্রের (সোসিওলজি) একজন খ্যাতনামা অধ্যাপকের মুখে ভারতের মনুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

বক্তা বলিতেছিলেন,—"যীশুখ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বে ভারতে এমন একজন মনীষী জন্মিয়াছিলেন, যিনি "প্ল্যাণ্ড সোসাইটির" পরিকল্পনা দিয়াছিলেন—ইহা ভাবিতেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তদপেক্ষাও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একটা সমাজ (হিন্দুসমাজ) তখন এতখানি জীবন্ত ছিল যে, ঐ সমাজ-বিজ্ঞানীর দেওয়া পরিকল্পনা সমাজ জীবনে সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োগ করিয়া ফেলিল। "মনুর প্ল্যানে" কোন দোষ ছিল কি না, কিংবা তৎপ্রয়োগে হিন্দুসমাজের কোন ক্ষতি হইয়াছিল কি না, ইহা আমাদের আলোচ্য নহে—মানুষের কার্য্যে দোষ ত্রুটি থাকিতে পারে। একটা সামাজিক "প্ল্যান" ছিল ও তাহা একটা বাস্তব সমাজে সত্যসত্যই রূপায়িত হইয়াছিল ইহাই পরম গৌরবের সংবাদ।

যখন ইউরোপে সভ্যতার সূতিকাগারও তৈয়ারী হয় নাই, ভারতে তখন "প্ল্যাণ্ড সোসাইটি" কার্য্যকর ছিল ইহা পাশ্চাত্ত্য সমাজ-বিজ্ঞানী ধুরন্ধরদের অসীম বিস্ময় সৃষ্টি করে। যে সমাজ-বিভাগ আমাদের নাসিকাকুঞ্চন আনে, তাহা আজ পাশ্চাত্ত্য মনীষীদিগের অকুণ্ঠ প্রশংসাবাণী লাভ করে।

গীতার বক্তা শ্রীভগবানের অভিমত এই যে, কেবলমাত্র শূদ্রই সমাজের সেবক নহে, সকলেই সমাজের সেবক। যাহার যে কর্ম তাহা সে সুষ্ঠুভাবে করিলেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। "স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ"—(১৮।৪৫)। গীতার মতে কর্মের ছোট বড় নাই। বড় বড় অনুষ্ঠানও ছোট, যদি তাহার মধ্যে অহংকর্তৃত্ব ও ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে। অতি ক্ষুদ্র কর্মও মহান্, যদি কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত হয়।

গুণকর্মের ঘাতপ্রতিঘাতে যে মানুষ যেখানে আসিয়া পড়ুক না কেন, সেই স্থানের কর্ত্তব্যটুকু যথাযথভাবে সুনিষ্পন্ন করিতে পারিলেই জীবনে শান্তি আসে। ভগবৎ-পূজার যত উপচার তন্মধ্যে নিজ কর্ত্তব্য পালনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই উপচারে পূজা সমাপন করিয়া মানুষ নিশ্চিত সিদ্ধিলাভে কৃতকৃতার্থ হয়।

"স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।"—(১৮।৪৬)

সাত

চতুর্থ অধ্যায়

গহনা কর্ম্মণো গতিঃ

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রধান লক্ষ্য, কর্ম ও জ্ঞানভূমির একত্ব সাধন। তৃতীয় অধ্যায়ে "লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা" (৩।৩)—কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ—দ্বিবিধ নিষ্ঠা, এই কথা বলিয়াছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে বলিবেন, "একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি' (৫।৫)—কর্ম ও জ্ঞানযোগকে যিনি এক দেখেন তিনিই যথার্থদর্শী।

মধ্যবর্ত্তী চতুর্থ অধ্যায়ে ঐ দুইকে একত্বে পর্যবসানের চেষ্টা চলিতেছে। এই অধ্যায়ে দেখাইবেন যে, কর্মযোগের সাধনাই সাধককে জ্ঞানযোগে পৌঁছাইয়া দেয়। (সাধনভূতঃ কর্মযোগঃ সাধ্যভূতঃ জ্ঞানযোগঃ—মধুসূদন)। প্রকৃত কর্মী—কর্মযোগী

নিজ অজ্ঞাতসারে জ্ঞানযোগী হইয়া যায়। সমস্ত কর্মই আসিয়া জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে, "জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"—(৪।৩৩)।

জীবের এই কর্মপ্রবাহে ঈশ্বরের কোন পক্ষপাতিত্ব নাই—তাঁহার কোনপ্রকার বৈষম্য দোষ নাই—"আপ্তকামস্য কা স্পৃহা।" এই তথ্যটি "যে যথা মাং" (৪।১১) হইতে "ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি" (৪।১৪) পর্যন্ত বলিলেন (চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ ঈশ্বরস্য বৈষম্যং পরিহৃত্য—শ্রীধর)। পঞ্চদশ শ্লোক হইতে প্রকৃত কর্মযোগের কথা আরম্ভ করিলেন।

এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন যে, আমাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট এই যোগ রাজর্ষিগণের পরম্পরাপ্রাপ্ত সম্পদ্। আবারও বলিলেন, প্রাচীনেরা—যুগযুগান্তর পূর্ব্ববর্ত্তী মুমুক্ষুরা এই যোগের পথে চলিয়াছেন—"পূর্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্" (৪।১৫)। অতএব হে অর্জ্জুন, "কুরু কর্মৈব"—কর্মই কর।

কর্ম করিতে হইবে ইহা তো সহজ কথা, এজন্য প্রাচীনদের দোহাই দেওয়া কেন? হেতু এই যে, কর্মের স্বরূপ-বিজ্ঞানে বিস্তর সংশয়ের অবকাশ আছে। স্থূল বুদ্ধিতে মনে হয়, দেহেন্দ্রিয়াদির ব্যাপারই কর্ম, তাহা না করাই অকর্ম, আর নিষিদ্ধ কর্ম করার নাম বিকর্ম। কিন্তু এই মাত্র বুঝিলেই সব বুঝা হইবে না। কর্মের মধ্যে অকর্ম, অকর্মের মধ্যে কর্ম দেখিতে হইবে। তবে ঠিক ঠিক দেখা হইবে—সমগ্র তত্ত্বটি বুঝা যাইবে।

এই জন্য বলিয়াছেন, কর্মের গতি গহনা—"বিষমা দুর্জ্ঞেয়া"। গতি পদে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, "গতির্যাথাত্ম্যং তত্ত্বমিত্যর্থঃ"

—কর্মের তত্ত্ব দুরধিগম্য। যাঁহারা বিবেকী তাঁহারাও কর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে মোহযুক্ত—"কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।" দ্রুতগামী যানে গমনকালে দূরস্থ গতিহীন বৃক্ষরাজিকে গতিমান্ মনে হয়, পক্ষান্তরে গতিশীল নিজ যানকে কখনও কখনও স্থির মনে হয়। এই সকল লৌকিক ক্রিয়াস্থলেই যখন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরও ভ্রম দেখা যায়, তখন পারমার্থিক কর্মে যে বিশেষ ভ্রম হইতে পারে তাহা আর আশ্চর্য্য কি? "নৌস্থস্য নাবি গচ্ছন্ত্যাং তটস্থেষ্বগতিকেষু নগেষু প্রতিকূলগতিদর্শনাৎ"—শঙ্কর)।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, অর্জ্জুন, কর্মের রহস্য প্রাচীন রাজর্ষিরা জানিতেন। আমি তাঁহাদিগকে জানাইয়াছিলাম (প্রোক্তবানহং)। আজি আমি আবার তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা জানিলে আর অশুভ থাকিবে না—"মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ"। 'তত্তে কর্ম" (৪।১৬), এখানে মধ্যে একটি 'অ'কার প্রশ্লেষ করিয়া "তত্তেঽকর্ম' —অকর্মের রহস্য বলিতেছি শুন, এরূপ অর্থও করা যায়।

তিনটি বিষয় বুঝিতে হইবে। কর্ম, অকর্ম, বিকর্ম। শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্যই কর্ম। শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্মই বিকর্ম, আর সমস্ত-কর্মসন্ন্যাসের নাম অ-কর্ম। ইহার প্রত্যেকটিরই বিশেষ বিবরণ না জানিলে ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" এইরূপ শাস্ত্রবাক্য আছে। প্রাণিমাত্রকেই হিংসা করিবে না। এই বাক্যহেতু হিংসা করা "বিকর্ম," কিন্তু সকাম যজ্ঞানুষ্ঠানকারীর পক্ষে "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" এইরূপ শ্রুতিবাক্য থাকায় যজ্ঞ সম্পর্কে পশুবধ বিকর্ম হইবে না।

পুনশ্চ, বিকর্ম হইবে না বলিয়া উহা শাস্ত্রীয় বিধি বলিয়া কর্মও হইবে না। কেন না, শাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘনে প্রত্যবায় হয়, কাম্য যজ্ঞাদি না করিলে কিন্তু কোন প্রত্যবায় হইবে না। সুতরাং যজ্ঞে পশুবধের ব্যবস্থা শাস্ত্রবিধি নহে, অতএব "কর্ম্ম"ও নহে।

শাস্ত্রে বহু প্রকারের বাক্য আছে, সকল বাক্যই বিধিবাক্য নহে। বিধিবাক্য ছাড়া, একপ্রকার নির্দ্দেশকে পরিসংখ্যা বাক্য কহে। যজ্ঞে পশুহিংসার ব্যবস্থা পরিসংখ্যা বাক্য মাত্র। উহা হিংসা-কর্মে প্রেরণা নহে, কৌশলে নিবৃত্তিরই বোধক। পশুবধের বিধি শাস্ত্রে নাই, আমিষাশী লোকের যথেচ্ছ আমিষাহার প্রবৃত্তিকে সংযত করিবার জন্য ঐ ব্যবস্থা।

সদা সত্য কথা বলিবে ইহা শাস্ত্রবিধি, সুতরাং 'কর্ম।" কিন্তু সত্য কথায় যদি অন্যের প্রাণহানি বা গুরুতর অশুভ ফল উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে উহা 'বিকর্ম' হইবে। মিথ্যা বলা 'বিকর্ম,' কিন্তু যদি কোন মহতের প্রাণরক্ষা—সতীর মর্যাদা রক্ষার জন্য উহা আবশ্যক হয় তবে উহা 'কর্ম' হইতে পারে। অসৎ-সংকল্পে সত্য-কথা অসত্যের সমান। সত্য-সংকল্পে অসত্যও কখনও সত্যতুল্য।

উৎকোচ প্রদান পাপ। সুতরাং বিকর্ম। সনাতন গোস্বামি-পাদ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবায় জীবন সমর্পণের জন্য কারারক্ষীকে উৎকোচ দিয়াছিলেন। কৃষ্ণই সনাতনকে বিষয়কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, এইরূপ উক্তি করিয়া মহাপ্রভু

ঐ প্রকারে গৃহত্যাগ অনুমোদন করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে বিকর্ম "কর্ম" হইয়াছে।

বাহিরে আঘাত না করিয়াও যদি হিংসাপূর্ণ চিত্তে মনে মনে কাহাকেও আঘাত করিবার সংকল্প করা হয় তাহাতে হিংসাজনিত পাপাশ্রয় করিবে—"য আস্তে মনসা স্মরন্, মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে"। পরন্তু কাহারও পক্ষে শাণিত ছুরিকা প্রবেশ করাইলেও হিংসা করা হইবে না, যদি প্রবেশকারী ব্যক্তি হন চিকিৎসক ও উদ্দেশ্য হয় রোগ-নিরাময়।

কোন কর্ম না করিয়া চুপচাপ বসিয়া আছি—সুতরাং আমি কর্মহীন কর্মত্যাগী বা কর্মাতীত হইয়াছি—এরূপ মনে করা ঠিক হইবে না। কেন না, দেহ নিয়ত ব্যাপারশীল। একটি ক্ষণও দেহ কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। অধিকন্তু যেহেতু আমি নিশ্চেষ্ট, সেই হেতুই আমি কর্মাতীত, এইরূপ অভিমানও মিথ্যা জ্ঞান। ঐ মিথ্যাজ্ঞান 'বিকর্ম' পর্য্যায়। সুতরাং দেহ চেষ্টাহীন হইলেও "অকর্ম" হয় না।

পক্ষান্তরে কেহ অবিরাম কর্ম করিতেছে, কিন্তু আমি কর্ত্তা বলিয়া তাহার কোন অভিমান নাই, কর্মের ফলের জন্যও তাহার কোন কামনা নাই। ইন্দ্রিয়গণ কর্ম করিতেছে, সে তাহার দ্রষ্টা হইয়া আছে। যেমন অন্যের কর্মের দ্রষ্টা হওয়া যায়, সেইরূপ নিজের কর্মেরও দ্রষ্টা হওয়া যায়। ঐরূপ ব্যক্তির বিপুল কর্মও কর্ম নহে—'অকর্ম'। কাহাকেও বধ করিলেও সে বধভাগী হইবে না—"হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে।"

কর্মের ফল বন্ধন। বন্ধন হইবে কাহার? যে কর্ত্তা তাহারই

বন্ধন ঘটে। কিন্তু কর্ম্ম করিলেই সে কর্ম্মকর্ত্তা হয় না। যাহার কর্ত্তৃত্বাভিমান আছে সেই কর্ত্তা। অভিমান থাকিলে কর্ম্ম না করিলেও কর্ত্তা হইবে ; কর্ত্তৃত্বাভিমানহীন ব্যক্তি কর্ম্ম করিলেও অকর্ত্তা।

ভোগ করিলেই ভোক্তা হয় না। ভোগ না করিলেও ভোক্তা হয়, যদি ভোগাভিলাষ থাকে। ভোগাভিলাষবিহীন ব্যক্তি অভোক্তা। যিনি অকর্ত্তা ও অভোক্তা তিনি নিত্যতৃপ্ত। পরম আনন্দস্বরূপ ভগবৎপ্রাপ্তিতে তিনি সকল বিষয়ে আকাঙ্ক্ষাহীন।

দেহীর আশ্রয় দেহ। যাহার দেহেতে আত্মজ্ঞান সে দেহাশ্রয়ী, যাহার দেহেতে আত্মজ্ঞান নাই সে নিরাশ্রয়। কর্ত্তৃত্বাভিমানহীন ব্যক্তি নিরাশ্রয়। যিনি নিত্যতৃপ্ত ও নিরাশ্রয়, তিনি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও কিছুই করেন না—"নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ"—(৪।২০)।

এই প্রকারে কর্ম্মে অকর্ম্ম, অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন করিতে হইবে। ফলতৃষ্ণাকে বলে কাম। 'অহং করোমি" এই অভিমানকে বলে সংকল্প। যে ভূমিকায় এই দুইটি নাই "কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ— (৪।১৯) সেইটি জ্ঞানভূমি। জ্ঞানভূমির কর্ম্ম জ্ঞান দ্বারা দগ্ধ হইয়া—"জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং" অকর্ম্ম হইয়া যায়।

যাঁহার তৃষ্ণা নাই (নিরাশীঃ), চিত্ত যাঁর সুসংযত, যিনি ভোগোপকরণ ত্যাগ করিয়াছেন (ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ), তিনি কদাপি পাপে লিপ্ত হন না (নাপ্নোতি কিল্বিষং)। কিল্বিষ পদে কেবল যে পাপ বুঝায় এমন নহে, পুণ্যও বুঝাইতে পারে। পাপ যেরূপ অনিষ্ট প্রদান করে পুণ্যও সেইরূপ করিতে পারে। মুমুক্ষুর পক্ষে স্বর্গফল অনিষ্টকর। সুতরাং পারমার্থিক দৃষ্টিতে

পুণ্যও পাপ। যিনি প্রকৃত ত্যাগী তিনি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ত্তব্য না করিলেও প্রত্যবায়ী হন না।

এই প্রকরণের মূল সূত্রটি হইল কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখা, অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখা। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, অর্জ্জুন, ঐরূপ যিনি দেখেন, মনুষ্য মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান্ (স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু), তিনিই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা (কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ)।

কর্ম্মগুলি বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া—মূঢ় জীব ভ্রমবশতঃ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে আত্মাতে আরোপ করে। যিনি জানেন ইন্দ্রিয়ই কর্ত্তা,—"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ— (৩।২৭), আত্মা অকর্ত্তা, তিনি ইন্দ্রিয়ের আরোপিত অকর্ম্মকেই কর্ম্ম দেখেন, আত্মায় আরোপিত কর্ম্মে অকর্ম্ম (কর্ম্মাভাব) দেখেন।

প্রকৃতির কার্য্য এই বিশ্বপ্রপঞ্চই "কর্ম্ম"। এই প্রপঞ্চের যিনি অন্তরাত্মসদৃশ সেই চৈতন্যঘন পরমাত্মা বস্তুই অকর্ম্ম (কর্ম্মহীন)। যিনি কর্ম্মময় জগতে ব্রহ্মসত্তা ভিন্ন আর কিছু দেখেন না, ব্রহ্মে সর্ব্ব জগতের সত্তা দেখেন—"যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি" (৪।৩৫)—যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখেন, অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন, তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা।

বিভক্ত বস্তুতেই কর্ম্ম আছে, অবিভক্তে কর্ম্ম নাই। অংশেই গতি আছে, পূর্ণের গতি নাই। যিনি অংশের মধ্যে পূর্ণকে দেখেন, পূর্ণের মধ্যে অংশকে দেখেন—"অবিভক্তং বিভক্তেষু"— (১৮।২০)—তিনি প্রকৃত জ্ঞাতা, প্রকৃত কর্ম্মকৃৎ।

শ্রুতি ব্রহ্মস্বরূপের কথা বলিয়াছেন—তিনি চলেন, তিনি চলেন না—"তদেজতি তন্নৈজতি।" এক সময় চলেন, অপর

সময় চলেন না, এমত নহে। যখন চলেন, তখনই চলেন না। যখন চলেন না, তখনই চলেন। ইহাই কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন, অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন। ইহাই দার্শনিকের পারমার্থিক দৃষ্টি।

এই পারমার্থিক অখণ্ড দৃষ্টি যাঁহার হইয়াছে গীতাকার তাঁহার নামকরণ করিয়াছেন "ব্রহ্মকর্ম্মসমাধি।" শ্রীশঙ্কর এই নামাক্ষরের অর্থ করিয়াছেন—"ব্রহ্মৈব কর্ম্ম ব্রহ্মকর্ম্ম। তস্মিন্ সমাধিঃ যস্য সঃ।" সমাধি বলিতে চিত্তের একাগ্রতা। "চিত্তৈকাগ্র্যং"—শ্রীধরঃ। "ব্রহ্মকর্ম্মসমাধি" ব্যক্তির সকল কর্ম্মই যজ্ঞ। সকল যজ্ঞই ব্রহ্মময়।

বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদনে কয়েকটি বস্তু অপরিহার্য্য—যজ্ঞকারী, উদ্দিষ্ট দেবতা, অগ্নি, উপকরণ (হবিঃ), কোশাকুশি ইত্যাদি পাত্র। ব্রহ্মকর্ম্ম-সমাধি ব্যক্তি ঐ সকল বস্তুই ব্রহ্মময় দর্শন করেন। তিনি দেখেন এক অবিভক্ত সত্তা স্বীয় অবিভক্ততায় স্থিত থাকিয়া বিভক্তাকারে—"বিভক্তমিব চ স্থিতম্" (১৩।১৭)—আপনাকে আপনি হোম করিতেছেন।

"জ্ঞানাবস্থিত" ব্যক্তি জীবনের সমুদয় কর্ম্মই যজ্ঞময় দর্শন করেন। তাঁহার নিজ জীবনটি যজ্ঞ। বিশ্বজীবনের বিরাট কর্ম্মও ব্রহ্মাণ্ডশালার একটি মহাযজ্ঞ। যজ্ঞবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে করিতে—"যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম"—(৪।২৩) ঐ মহানুভূতির উদয় হইয়া থাকে। ঐ অনুভূতি যাঁর হয় তাঁর সমগ্র কর্ম্মই "অকর্ম্ম" হইয়া যায়।

গীতার (৪।২৩) শ্লোকের "সমগ্র" পদের এক অভিনব অর্থ করিয়াছেন আচার্য শঙ্কর—"সহাগ্রেণ কর্ম্মফলেন বর্ত্ততে।"

তাঁহার ফলের সহিত সমস্ত কর্ম্ম বিলয় প্রাপ্ত হয় (প্রবিলীয়তে), শেষে অকর্ম্মই অবশেষ থাকে। এই অকর্ম্মই মূলতঃ ব্রহ্ম। এইভাবে গীতা কর্ম্মকে ব্রহ্মভূমিতে আনিয়াছেন। আবার ক্রমে ব্রহ্মকে কর্ম্মভূমিতে নিতে হইবে। তৎপূর্ব্বে যজ্ঞের নানাবিধ ভেদের কথা বলা হইয়াছে।

আট

দ্বাদশ যজ্ঞ

(ক)

চতুর্থ অধ্যায়ে পঁচিশ হইতে নয়টি মন্ত্রে যজ্ঞভেদ প্রকরণ। কর্ম্মযজ্ঞের দ্বাদশ প্রকার ভেদ কথিত হইয়াছে। (১) দৈবযজ্ঞ, (২) ব্রহ্মযজ্ঞ, (৩) ইন্দ্রিয়-সংযমযজ্ঞ, (৪) অনাসক্তিযজ্ঞ, (৫) আত্মসংযমযজ্ঞ, (৬) দ্রব্যযজ্ঞ, (৭) তপোযজ্ঞ, (৮) যোগযজ্ঞ, (৯) স্বাধ্যায়যজ্ঞ, (১০) জ্ঞানযজ্ঞ, (১১) ব্রতযজ্ঞ, (১২) প্রাণায়ামযজ্ঞ।

ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মযজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞ মূলতঃ একই কথা। ইহা স্বরূপতঃ কর্ম্মযজ্ঞ নহে। সকল কর্ম্মযজ্ঞের পরিসমাপ্তি জ্ঞানযজ্ঞে। একথা ক্রমে ব্যক্ত করিতেছেন। জ্ঞানযজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন এই প্রকরণের লক্ষ্য।

দৈবযজ্ঞ। দেবতার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ দৈবযজ্ঞ। দর্শ, পৌর্ণমাস, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রমুখ

দেবতাদের তৃপ্তিবিধানের জন্য করা হয়। দৈবযজ্ঞের কথা পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে, "যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা মানবগণ দেবগণকে সন্তুষ্ট করিবে। দেবগণও মানবগণকে সন্তুষ্ট করিবেন। এইরূপ পরস্পরের সন্তুষ্টি দ্বারা পরম কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হইবে।" "পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ"—(৩।১১)।

যজ্ঞাদি দ্বারা ইন্দ্র-প্রমুখ দেবতাগণ তুষ্ট হইলে পুত্র, অন্ন, সুবর্ণাদি বহু বাঞ্ছিত ভোগ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সকল দেব-দত্ত দ্রব্য দ্বারা পুনঃ দেবোদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা বিধেয়। যে ব্যক্তি উহা না করিয়া কেবল নিজে ভোগ করে, সে পরস্বাপহারী চোরের মত—"তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ"—(৩।১২)।

ইন্দ্রাদি দেবগণ তত্ত্বতঃ ব্রহ্মই। কিন্তু ইঁহাদিগকে ব্রহ্মবুদ্ধি না করিয়া পৃথক্ পৃথক্ দেবতা-বুদ্ধি করিলে তদুদ্দেশ্যে কৃতকর্ম দৈবযজ্ঞ হইবে। "দৈবমেব" এই উক্তির (৪।২৫) "এব" পদের তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণে শ্রীধর লিখিয়াছেন "এবকারেণ ইন্দ্রাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্যং দর্শিতম্"। এই দৈবযজ্ঞ কর্মযোগীরা শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠান করেন।

ব্রহ্মযজ্ঞ। শ্রুতিতে ব্রহ্মবস্তুর স্বরূপ লক্ষণ হইল "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম", "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" "তৎ" পদ দ্বারাও ব্রহ্ম অভিহিত হন। ব্রহ্মকে বলা হইয়াছে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি (ব্রহ্মাগ্নৌ)। ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি হইবে "যজ্ঞ"-রূপ বস্তুর। এস্থলে "যজ্ঞ" বলিতে আত্মা বুঝাইতেছে ; যজ্ঞশব্দবাচ্য আত্মা। "আত্মনামসু যজ্ঞশব্দস্য পাঠাৎ"—শঙ্কর।

আহুতিদানের উপায়টিও "যজ্ঞ"। "যজ্ঞেন" ব্রহ্মার্পণরূপ যজ্ঞ দ্বারা এই আহুতি নিষ্পন্ন হইবে। "আত্মাকে" জ্ঞানযোগীরা বলেন "ত্বং"। এই "ত্বং" বস্তুকে "তৎ" বস্তুতে, অগ্নিতে ঘৃতাহুতির তুল্য সমর্পণই ব্রহ্মযজ্ঞ। ঘৃত যেমন বহ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়, কিছুই থাকে না, সেইরূপ "ত্বং" বস্তু "তৎ"-এ বিলীন হইয়া যায়। বস্তুতঃ "ত্বং" আর "তৎ" একই সত্তা। পার্থক্য মাত্র এই যে, "ত্বং"-বস্তু সোপাধিক ব্রহ্ম, আর "তৎ"-বস্তু নিরুপাধিক ব্রহ্ম। সোপাধিক আত্মাতে নিরুপাধিক ব্রহ্ম দর্শনই হইল ব্রহ্মযজ্ঞের হোম। "সোপাধিকস্যাত্মনো নিরুপাধিকেন পরব্রহ্মস্বরূপেণৈব যদ্দর্শনং স তস্মিন্ হোমঃ"—শঙ্কর। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা হইলেন ব্রহ্মৈকাত্ম্যদর্শন-নিষ্ঠ সন্ন্যাসীরা।

ইন্দ্রিয়সংযম যজ্ঞ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। ইহাদের গ্রাহ্য বিষয় হইল যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ। সকল বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া সংযমরূপ অগ্নিতে হোমসাধন হইল ইন্দ্রিয়সংযম-যজ্ঞ।

যোগসূত্রে পতঞ্জলি সংযমের সুন্দর লক্ষণ করিয়াছেন। "ত্রয়মেকত্র সংযমঃ" (৩।৪)। একটিমাত্র বস্তুর ধারণা ধ্যান ও সমাধিকে সংযম বলে। কোনও বস্তুতে মনকে অবিচলিতরূপে স্থাপন হইল ধারণা। বিজাতীয় চিন্তা দূর হইয়া গেলে ধারণাযুক্ত চিত্তে কোন ঈশ্বরীয় রূপ-প্রবাহ একতান হইয়া ভাসমান হইতে থাকিলে তাহাকে ধ্যান বলা যায়। ধ্যানযুক্ত চিত্তে ধ্যাতা যখন কেবল ধ্যেয়ের আকারে আকারিত হয় তখন তাহাকে সমাধি বলে। যখন তাহাও থাকে না, ধ্যাতা ধ্যেয় ধ্যান সব মিলিয়া শেষ হইয়া

কেবল আনন্দানুভূতিমাত্র অবশেষ থাকে, তখন তাহাকে বলা হয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। একই ধ্যেয়-বস্তুতে, ধারণা-ধ্যান-সমাধি হইলে তাহাই যোগশাস্ত্রের "সংযম"। সংযম শব্দটি এস্থলে পরিভাষা। সংযমাগ্নিতে ইন্দ্রিয়ের সমাধি, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য।

অনাসক্তি-যজ্ঞ। এই যজ্ঞের কর্ত্তা গৃহস্থাশ্রমীরা। ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসকল প্রত্যেকেই গ্রহণ করেন। যিনি আসক্ত হইয়া করেন, যিনি অহংকর্তৃত্ব বুদ্ধিতে ফলকামী হইয়া করেন, তাঁহার কর্ম, যজ্ঞ হয় না। যিনি অনাসক্ত হইয়া করেন, যিনি কর্তৃত্বাভিমান-শূন্য হইয়া, ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া, কামসঙ্কল্পবর্জিত হইয়া, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু গ্রহণ করেন তিনিই অনাসক্তি-যজ্ঞ সাধন করেন। অনাসক্তি-যজ্ঞকারী ব্যক্তি অহংকার-বিমূঢ় হইয়া নিজেকে কর্ত্তা মনে করেন না। তিনি জানেন প্রকৃতির গুণসকলই সমস্ত কর্মের কর্ত্তা, আত্মা দ্রষ্টা মাত্র, "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্ব্বশঃ" (৩।২৭)।

আত্মসংযম-যজ্ঞ। এই যজ্ঞের আচার্য হইতেছেন ধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণ ("অপরে ধ্যাননিষ্ঠাঃ"—শ্রীধর)। এই যজ্ঞের অগ্নি হইল আত্মসংযম-যোগ আর হবিঃ হইল, সমস্ত ইন্দ্রিয়-কর্ম ও প্রাণকর্ম।

ইন্দ্রিয়-কর্ম বলিতে বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ, চক্ষুঃকর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্, বুদ্ধি চিত্ত অহংকার—এই সকলের কর্ম। প্রাণকর্ম বলিতে প্রাণ অপান সমান ব্যান উদান, নাগ কূর্ম কৃকর দেবদত্ত ধনঞ্জয়—এই দশবিধ প্রাণের যাবতীয় কর্ম উদ্দিষ্ট। এই সকল ইন্দ্রিয়কর্ম ও প্রাণকর্মের সমবায়কে সূক্ষ্ম শরীর বলা চলে। যজ্ঞ-কারী এই সূক্ষ্মদেহকে আহুতি অর্পণ করেন আত্মসংযমযোগরূপ

অগ্নিতে। ("আত্মনি সংযমঃ ধ্যানৈকাগ্র্যম্। স এব যোগঃ। স এব অগ্নিঃ"—শ্রীধর)। আত্মসংযমযোগ অর্থ আত্মাকে সর্ব বিষয় হইতে টানিয়া লইয়া একতান বা সমাহিত করা। সমাধি কার্য্যটি দুই প্রকারে হয়। এক হয় লয়পূর্ব্বক, আর হয় বাধপূর্ব্বক। এস্থলে বাধপূর্ব্বক সমাধি বুঝিতে হইবে। সেইজন্য "জ্ঞানদীপিতে" বিশেষণটির প্রয়োগ হইয়াছে। কথাটি পরিষ্কার করা যাইতেছে।

ভূতশুদ্ধ্যাদি মন্ত্রের অনুরূপ ভাবনা দ্বারা এক প্রকার সমাধি হয়। তাহাতে পঞ্চভূতাত্মক দেহকে পঞ্চমহাভূতে, মহাভূতগণকে আকাশে, আকাশকে অহংতত্ত্বে, অহংকারকে মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্বকে মূল প্রকৃতিতে, মূল প্রকৃতিকে চৈতন্যে লয় করিয়া দিবার জন্য ভাবনা করিতে হয়। এই ভাবনায় সমাধি হয়। এই সমাধিকে বলে লয়পূর্ব্বক সমাধি। ইহাতে কিছু স্থায়ী ফল হয় না, কারণ ইহাতে অবিদ্যার বিনাশ হয় না।

অবিদ্যার মিথ্যাত্ব-নিশ্চয়কে বলে "বাধ"। বাধপূর্ব্বক যে সমাধি তাহাতেই ব্রহ্মৈকাত্মতার অনুভূতি হয়। এই অনুভূতির ফল স্থায়ী। এই সমাধিকেই "জ্ঞানদীপিত" সমাধি বলে। অনাত্মবস্তুর মিথ্যাত্বনিশ্চয়-পূর্ব্বক আত্মা পরমাত্মার অভিন্নতা বোধ হইলে যে সমাধি হয়, তাহাই বাধপূর্ব্বক জ্ঞানদীপিত সমাধি।

জল শুকাইয়া গেলে যেমন সূর্য্যের জলস্থ প্রতিবিম্ব থাকে না, গগনস্থ সূর্য্যই থাকে, সেইরূপ বিচার দ্বারা অবিদ্যা চলিয়া গেলে আর মিথ্যা ভেদবুদ্ধি থাকে না, অভিন্নবুদ্ধি বা একাত্মতাই অবশেষ থাকে। আত্মসংযমরূপ যজ্ঞাগ্নি যখন ব্রহ্মাত্মজ্ঞান দ্বারা

উদ্দীপিত হয়, তখন যোগী তাহাতে তাঁহার লিঙ্গদেহ আহুতি প্রদান করেন।

দ্রব্যযজ্ঞ। তীর্থাদিতে দ্রব্যাদি দান, অন্নাদি বিতরণ, কূপতড়াগাদি খনন, মঠমন্দিরাদি নির্ম্মাণ বা সংস্কারসাধন, শরণার্থীকে আশ্রয়স্থান দান প্রভৃতি কার্য্য দ্রব্যযজ্ঞ। এই সকল কার্য্য যদি যজ্ঞবুদ্ধিতে অর্থাৎ যজ্ঞ—জীবের কল্যাণার্থ করিতেছি এই বুদ্ধিতে করা যায়, তাহা হইলে উহা দ্রব্যযজ্ঞ হইবে ("তীর্থেষু দ্রব্যবিনিয়োগং যজ্ঞবুদ্ধ্যা কুর্ব্বন্তি যে তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ"—শঙ্কর)। এইরূপ বুদ্ধিপূর্ব্বক না করিলে তাহা যজ্ঞনামে গণ্য হইবে না।

তপোযজ্ঞ। তপস্যাকেই যাঁহারা ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা তপোযজ্ঞপরায়ণ ("তপ এব যজ্ঞঃ যেষাং তপস্বিনাং তে তপোযজ্ঞাঃ"—শঙ্কর)। চান্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠান, ক্ষুধাতৃষ্ণা শীত আতপ-সহিষ্ণুতাসাধন, শত অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিয়া প্রশান্তভাবে অবস্থান প্রভৃতি তপস্যা তপোযজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত।

যোগযজ্ঞ। চিত্তের বৃত্তিসমূহকে নিরোধ করার নাম যোগ। বৃত্তিনিরোধই যাঁহাদের যজ্ঞ তাঁহারা "যোগযজ্ঞাঃ।" যোগযজ্ঞকারীরা যমনিয়মপালনপরায়ণ। শাস্ত্রমতে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ, ইহাদিগকে "যম" বলে। শৌচ, সংযম, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধানকে "নিয়ম" বলা হয়। যমনিয়ম পালন-পরায়ণ সাধকই যোগযজ্ঞী।

স্বাধ্যায়যজ্ঞ। স্বাধ্যায় অর্থ বেদপাঠ ("স্বাধ্যায়ো যথাবিধি ঋগাদ্যভ্যাসো যজ্ঞঃ যেষাং তে স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ"—শঙ্কর)। ব্রহ্মচর্য্য

অবলম্বনপূর্ব্বক গুরুসেবাপরায়ণ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বেদাভ্যাসের নাম বেদযজ্ঞ বা স্বাধ্যায়যজ্ঞ।

জ্ঞানযজ্ঞ। জ্ঞানশব্দে শাস্ত্রার্থাববোধ। গভীর যুক্তিবিচার অনুশীলনপূর্ব্বক বেদার্থের নিশ্চয়াবধারণ যিনি যজ্ঞবুদ্ধিতে করেন, তিনি জ্ঞানযজ্ঞী।

দৃঢ়ব্রতযজ্ঞ। যে কোনও কার্য্যের বা নিয়মের কিছুমাত্রও ত্রুটি বিচ্যুতি না ঘটে এইভাবে নিত্য নিয়মিত অনুষ্ঠানের নাম দৃঢ়ব্রতযজ্ঞ। স্মৃতিতে বিহিত আছে,—

"সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং সংশিতব্রতাঃ।
বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্॥"

—যাঁহারা শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ব্বক নিয়মিত সন্ধ্যা উপাসনা করেন, তাঁহারা পাপশূন্য হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করেন। এই কার্য্যও কামনাপূর্ব্বক করিলে যজ্ঞ হইবে না। বস্তুতঃপক্ষে কামনা করা নিরর্থক। নিত্যক্রিয়া নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠান করিলে কর্মের স্বভাবগুণে ফল উপস্থিত হইবেই।

দ্বাদশ যজ্ঞ

(খ)

প্রাণায়াম যজ্ঞ। পাতঞ্জল যোগ দর্শন অনুসারে প্রাণায়াম করাও এক যজ্ঞ। প্রাণায়াম শব্দের প্রাণ শব্দে শ্বাস প্রশ্বাস উভয়ই বুঝায়। কিন্তু প্রাণ অপানের ভেদ করিতে হইলে, প্রাণ বলিতে বহির্নির্গত প্রশ্বাসবায়ু ও অপান বলিতে অন্তরাগত শ্বাসবায়ু বুঝাইবে।

এই অর্থে অপানে অর্থাৎ ভিতরে আকৃষ্ট শ্বাসে, প্রাণের—প্রশ্বাসের হোম করিলে পূরক নাম প্রাণায়াম হয়। এতদ্বিপরীত, প্রাণে অপানের হোম করিলে রেচক প্রাণায়াম হয়। প্রাণ অপান উভয়কেই নিরুদ্ধ করিলে সেই প্রাণায়াম কুম্ভক হইয়া যায়।

প্রাণ ও অপানের অন্য প্রকার প্রসিদ্ধ অর্থও আছে। প্রাণ অর্থে হৃদয়ে গতাগতিশীল বায়ু, অপান অর্থ নিম্নাঙ্গে বহির্গমনশীল বায়ু। সমান বায়ু থাকে প্রাণ-অপানের সন্ধিস্থলে—নাভিতে। প্রাণ অপানকে নিরুদ্ধ করিয়া বায়ুকে শান্ত ও স্থির করতঃ প্রাণায়াম-সাধনই অপানে প্রাণের ও প্রাণে অপানের আহুতি।

শ্রীধর বলেন, বায়ু 'হ'কার শব্দে বহির্গমন করে, 'স' শব্দে প্রবেশ করে। সুতরাং সর্ব্বদাই "হংসঃ সোঽহং, স এব অহং" এই অজপা অনুচিন্তন করিতে করিতে ব্রহ্মৈকাত্ম্য অনুভূতি হয়। ইহাই প্রাণে অপানের হোম ও অপানে প্রাণের হোম।

("হংসঃ সোঽহং ইত্যনুলোমতঃ প্রতিলোমতশ্চ অভিব্যজ্য-

মানেন অজপামন্ত্রেণ তত্ত্বংপদার্থৈক্যং ব্যতীহারেণ ভাবয়ন্তী-ত্যর্থঃ”)—শ্রীধর।

দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞের কথা বলা হইল। ইহা ছাড়া এই প্রকার আরও বহুবিধ যজ্ঞের কথা বৈদিক শাস্ত্রে উক্ত আছে, “বহুবিধা যজ্ঞা বিততাঃ”। যেমন গৃহস্থাশ্রমীর পঞ্চযজ্ঞের কথা আছে। পঞ্চসূনাকৃত পাপ পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা দূরীভূত হয়। ‘সূনা’ অর্থ বধস্থান। উদূখল, জাঁতা, চুল্লী, জলকুম্ভ, মার্জ্জনী এই পাঁচটি জীবহত্যার স্থান। তজ্জনিত পাপের নিবৃত্তির জন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞ করণীয়।

“ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ॥” মনু (৪।২১)

বেদাধ্যয়ন ও সন্ধ্যা উপাসনাদির নাম ঋষিযজ্ঞ। অগ্নিহোত্র বা গৃহদেবতার অর্চ্চনই দেবযজ্ঞ। গো-মহিষাদি ইতর প্রাণীর সেবা ভূতযজ্ঞ। অতিথি-সৎকারাদি নৃযজ্ঞ। শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি পিতৃযজ্ঞ।

যে কোন কর্ম অহংকার ও ফলাসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক করিতে পারিলেই যজ্ঞ হয়। তাহা দ্বারা “ক্ষপিতকল্মষাঃ” নিষ্পাপ হওয়া যায়। এই সকল যজ্ঞের একটিমাত্রও যিনি অনুষ্ঠান না করেন তাঁহার নাম হইয়াছে অ-যজ্ঞ (৪।৩১)। অ-যজ্ঞের ইহকালেই কোথাও স্থান হয় না, পরকালের তো কথাই নাই।

অ-যজ্ঞের ইহকালেই কোথাও স্থান নাই, এই কথা বলিবার হেতুটি বুঝিতে হইবে। ব্যাপক অর্থে যজ্ঞপদে পরার্থে ত্যাগ বুঝায়। পরার্থে ত্যাগ না থাকিলে মনুষ্যসমাজ চলে না। “সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা” (৩।১০)।

পাশ্চাত্ত্য সমাজতত্ত্বজ্ঞেরা বলেন যে নিজ স্বতন্ত্রতাকে পরিমিত না করিলে অন্যকে স্বতন্ত্রতা দেওয়া চলে না। প্রজার সঙ্গেই যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছে (৩।১০)—গীতার এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, যদি প্রত্যেক মনুষ্য তাহার নিজের স্বাধীনতার কোন অংশেরও যজ্ঞ না করে অর্থাৎ পরার্থে ত্যাগ না করে, তাহা হইলে লোকসমাজ অচল হইয়া পড়ে।

মহামান্য তিলক বলেন—"যজ্ঞই সমস্ত সমাজ রচনার আধার। কেবল কর্ত্তব্যদৃষ্টিতে যজ্ঞ করা যে পর্য্যন্ত প্রত্যেক মনুষ্য না শিখিবে, সেই পর্য্যন্ত সমাজের ব্যবস্থা ঠিক হইবে না।" মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে (৩।৪০) উক্ত হইয়াছে—ভগবান্ লোকসকলের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যজ্ঞচক্র উৎপাদন করিলেন এবং দেবতা মনুষ্য উভয়কে কহিলেন—এই চক্রে ব্যবহার পূর্ব্বক একে অপরের রক্ষা সাধন কর।

শান্তিপর্ব্বে যজ্ঞপ্রকরণে (২।৬৭) কথিত আছে—"অনুযজ্ঞং জগৎ সর্ব্বং যজ্ঞশ্চানুজগৎ সদা"—যজ্ঞের পশ্চাতে জগৎ। জগতের পশ্চাতে যজ্ঞ। এই জন্যই বলা হইয়াছে অ-যজ্ঞের ইহকালেই কোথাও স্থান নাই।

যিনি যজ্ঞ করিয়া অবশেষ গ্রহণ করেন তিনি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হন। যিনি অ-যজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞ না করিয়া নিজ পোষণের জন্য গ্রহণ করেন, তিনি স্তূপীকৃত পাপ আহার করিয়া থাকেন (গীতা ৩।১৩)। যজ্ঞাবশেষ ভোজনকারী অমৃত আস্বাদন করিয়া থাকেন এবং পরিণামে সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।

যজ্ঞ শব্দের মূল অর্থ দ্রব্যযজ্ঞ। তাহাকে লক্ষণা দ্বারা বিস্তৃত ও ব্যাপক করিয়া গীতাকার তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম, মনঃসংযম, সমাধি, বেদপাঠ, প্রাণায়াম প্রভৃতি ভগবৎপ্রাপ্তির সর্ব্বপ্রকার সাধনকে এক যজ্ঞ শিরোনামায় সমাবেশ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা এই তথ্যটি জানান হইতেছে যে, ছোট বড় প্রত্যেক কর্মই যজ্ঞ হইতে পারে। যোগ যেমন কর্ম্মের কৌশল, "কর্ম্মসু কৌশলম্", যজ্ঞও সেই প্রকার। একই কর্ম্ম, সাধন করিবার কৌশল জানিলে তাহার যজ্ঞত্ব হইবে, না জানিলে হইবে না। যজ্ঞকর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না (৩।৯)। গীতার লক্ষ্য—মানবের সমগ্র জীবনটিকে যজ্ঞময় করিয়া তোলা।

দ্রব্যময় যজ্ঞাদি অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ (৪।৩৩)। জ্ঞানযজ্ঞ বলিতে পূর্ব্বকথিত ব্রহ্মযজ্ঞই বুঝাইবে। জ্ঞানযজ্ঞ শব্দটি গীতায় পরে আরও দুইবার প্রযুক্ত হইয়াছে। "জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে"—(৯।১৫)। এই স্থলেই জ্ঞানযজ্ঞ পদের অর্থ পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ। ইহা ব্রহ্মযজ্ঞেরই অনুরূপ।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৭০ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, যে গীতাধ্যয়নকারী জ্ঞানযজ্ঞে আমার পূজা করে "জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ"—এইস্থলে দ্বাদশ যজ্ঞ মধ্যে "স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞশ্চ" বলিয়া যে শাস্ত্রাধ্যয়নরূপ জ্ঞানযজ্ঞের উল্লেখ আছে তদ্রূপ অর্থে গৃহীত।

শাস্ত্রাধ্যয়নরূপ জ্ঞানযজ্ঞ পরম্পরা-সম্বন্ধে ব্রহ্মযজ্ঞেরই কারণীভূত। শব্দব্রহ্মকে জানিলেই পরব্রহ্মকে জানা যায়। "শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।" মানবজীবনকে

জীবনদেবতার পায়ে সমর্পণই হইল এই জ্ঞানযজ্ঞের মূল কথা। অন্য সকল যজ্ঞ ইহার উপায়স্বরূপ মাত্র।

ব্রহ্মযজ্ঞে আমাদের ক্ষুদ্র সসীম আমিত্ব অসীমের ভূমানন্দে একীভূত হইয়া যায়। নিখিল কর্ম ব্রহ্মবস্তুতে পর্যাপ্তি লাভ করে। "জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"—(৪।৩৩) ইহার অর্থ শ্রীধর বলেন—"জ্ঞানে অন্তর্ভবতি" অর্থাৎ সকল কর্মময় দ্রব্যযজ্ঞাদি জ্ঞানযজ্ঞে অন্তর্লীন হইয়া যায়। ব্রহ্মযজ্ঞ সিদ্ধ হইলে অন্য সকল যজ্ঞ তাহার মধ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়া যায়।

যাঁহার "অহঙ্কাররূপ হবিঃ" অর্পিত হইয়া গিয়াছে হোমরূপে ঈশ্বরাগ্নিতে, তাঁহার জীবনটি যজ্ঞময়। তাঁহার প্রত্যেকটি কর্ম্মই কল্যাণপ্রদ। এই প্রকারে গীতার সকল কর্ম্মকে জ্ঞানযোগে পর্যবসান করিয়াছে। জ্ঞানে কর্ম্মের শেষ হইল। পরে আবার কর্ম্মের মধ্যেই জ্ঞানীর জ্ঞানের সার্থকতা দেখাইবেন।

পরবর্ত্তী প্রকরণে—চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ নয়টি মন্ত্রে জ্ঞান-প্রাপ্তির উপায় ও জ্ঞানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

দশ

"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রম্"

চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ প্রকরণে জ্ঞানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সর্ব্ববিধ কর্ম্মপ্রবাহ জ্ঞানসাগরে মিশিয়া জ্ঞানে পরিণত হয়, এই কথা বলিয়াছেন—(৪।৩৩) শ্লোকে। তৎপরে ৩৪ হইতে ৪০ শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞানের মহিমা বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। শেষের দুইটি শ্লোকে (৪১।৪২) একটু নূতন সুর আছে। সে কথা ক্রমে আলোচনা করিব। এক্ষণে জ্ঞানের গৌরব শ্রবণ করিব।

জ্ঞান বস্তুটি কি? তাহা প্রাপ্তির উপায় কি? জ্ঞানের ফল কি? অজ্ঞানী বা জ্ঞানভ্রষ্টের গতি কি? ইত্যাদি বিষয় কতিপয় শ্লোকে সুন্দরভাবে কথিত হইয়াছে।

জ্ঞানবস্তুর স্বরূপ বলিয়াছেন (৪।৩৫), যাহা পাইলে চরাচর সর্ব্বভূত (ভূতান্যশেষেণ) আত্মাতে দৃষ্ট হয় (দ্রক্ষ্যস্যাত্মনি) এবং আত্মসত্তা পরমাত্মসত্তাতে (অথো ময়ি) অনুভূত হয়, তাহাই জ্ঞান।

জগতে—বিশ্বচরাচরে যাহা কিছু ব্যক্ত, সকলই আত্মার আলোকে ব্যক্ত। আর আত্মা, পরমাত্মার সত্তায় সত্তাবান্। ইহাই জ্ঞান। অথো শব্দে অনন্তর বুঝায়, একটির পর আর একটির প্রকাশ। যদিচ ইহা কালিক-আনন্তর্য্য নহে, তাত্ত্বিক, তথাপি জ্ঞানের মধ্যে দুইটি স্তরবিন্যাস পাওয়া গেল।

প্রথম স্তরে, স্বীয় আত্মায় জগদ্-দর্শন। দ্বিতীয় স্তরে, ভগবৎ-সত্তায় আত্মসত্তা দর্শন। 'ময়ি' পদে শ্রীধর অর্থ

করিয়াছেন—'পরমাত্মনি'। শ্রীশঙ্কর বলিয়াছেন,—"ময়ি বাসুদেবে পরমেশ্বরে।"

যেমন চন্দ্রের আলোকে রজনী উদ্ভাসিত, তেমন আত্মার আলোতে জগৎ প্রকাশিত। ঐ চন্দ্রের আলো যেমন মূলতঃ সূর্যেরই বিম্বিত রশ্মি, আত্মার জ্যোতিও সেইরূপ বাসুদেবের দেওয়া সম্পদ্। এই অনুভূতিই জ্ঞান।

পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান নানাবিধ গবেষণার সাহায্যে জগদ্রহস্য অনুসন্ধান করিয়া যাহা আবিষ্কার করিতেছে লোকে তাহাকেই জ্ঞান বলিতেছে। গীতার মতে উহা জ্ঞান নহে। আত্মজ্ঞানসত্তায় জগৎসত্তা না দেখা পর্যন্ত জ্ঞান হইতে পারে না। জ্ঞানী তাহাই দেখেন, কিন্তু তাহাতেও গীতোক্ত জ্ঞানের পূর্ণাবয়ব প্রকাশিত হয় না। আত্মজ্ঞানী সাধক যখন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে আত্মার ও আত্মজ্ঞানের সার্থকতা অনুভব করেন, তখনই জ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই অনুভবের ভাষাই বৈষ্ণব কবির মুখে—
"তোমারি গরবে গরবিনী হাম।"

জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় বা সাধন বলিয়াছেন ছয়টি। তন্মধ্যে তিনটি বহিরঙ্গ ও তিনটি অন্তরঙ্গ। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটি বহিরঙ্গ সাধন। শ্রদ্ধা, তৎপরতা ও ইন্দ্রিয়সংযম এই তিনটি অন্তরঙ্গ সাধন।

আত্মাপকর্ষ-বোধপূর্ব্বক যে কায়চেষ্টা, তাহারই নাম প্রণিপাত। আমি হীন, অজ্ঞ, অক্ষম, এই বোধপূর্ব্বক আচার্যচরণে "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং" বলিয়া যে প্রপত্তি, তাহাই প্রকৃষ্ট প্রণিপাত।

মুক্তিকামী হইয়া, তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া আচার্য সমীপে আমি কে, সংসার বন্ধন কেন, কিসে বন্ধনমুক্ত হইব, কিসে প্রকৃত মঙ্গল হইবে—এই সকল জিজ্ঞাসার নাম পরিপ্রশ্ন। যেমন সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর পাদমূলে নতজানু হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

"কে আমি কেন আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥"

সেবা অর্থ সুখবিধান। যে যে কর্ম্মের দ্বারা আচার্যের প্রীতি-বিধান হয়, তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তৎ তৎ আচরণই সেবাপদ-বাচ্য। সেবা দ্বারা সাধকের চিত্ত, জ্ঞান গ্রহণের যোগ্য হয়। সেবা দ্বারা আচার্য শিষ্যের প্রতি করুণায় উন্মুখী হন। গুরুর করুণাতেই জ্ঞানের বীজ অন্তর্নিহিত।

"প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"—(৪।৩৪) ত্রিবিধ বহিরঙ্গ সাধনের কথা বলিয়া জ্ঞানপ্রাপ্তির অন্তরঙ্গ সাধনের কথা কহিতেছেন (৪।৩৯ শ্লোকে), "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।"

শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। আচার্যেরা ইহাকে জ্ঞানলাভের প্রথম ও প্রধান সোপান বলিয়াছেন। এই কথা পারমার্থিক জ্ঞান সম্বন্ধেই সত্য, ব্যবহারিক জ্ঞান সম্বন্ধে নহে। চক্ষুর দ্বারা রূপের জ্ঞান হয়, কর্ণ দ্বারা শব্দের জ্ঞান হয়, এই সকল লৌকিক জ্ঞানে শ্রদ্ধার বিশেষ কোন স্থান নাই, বরং অবিশ্বাসের কিছু মূল্য আছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যাপারে সংশয়, সত্য-নির্দ্ধারণে বিশেষ সহায়ক।

ব্যবহারিক জ্ঞানে মিথ্যা মিশ্রিত আছে বলিয়াই সংশয়ের উপযোগিতা আছে। পারমার্থিক জ্ঞানের সহিত মিথ্যার সংস্রব

নাই। উহা বুদ্ধি-বিচার বা তর্ক-বিতর্কের দ্বারা অধিগত হইতে পারে না। মহাভারতকার বলিয়াছেন, যে সকল ভাব অচিন্ত্য, তাহা তর্কের বিষয় নহে। "তান্ন তর্কেণ সাধয়েৎ"। কঠশ্রুতি বলেন, "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া"—(১।২।৯)—পারমার্থিক বিষয়কে তর্কের বিষয়ীভূত করিও না।

ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ভুলে ভরা। বিচারজ জ্ঞানও তদ্রূপ, মনের নানাবিধ সংস্কার দ্বারা দূষিত। উচ্চতর আধ্যাত্মিক সত্যকে জানিতে হইবে—গ্রহণ করিতে হইবে, বিশ্বাসের দ্বারা—গভীর শ্রদ্ধার দ্বারা। ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই। শ্রদ্ধাবান্ শব্দের অর্থ শ্রীধর বলিয়াছেন—"গুরূপদিষ্টেঽর্থে আস্তিক্য-বুদ্ধিমান্।"

গুরু বা শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা বা অটল বিশ্বাসই তত্ত্বজ্ঞান লাভের পক্ষে যথেষ্ট নহে। শ্রদ্ধা ত চাই-ই, তৎসঙ্গে চাই তদনুরূপ কর্ম্ম. তৎপরতা, একনিষ্ঠতা। শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসটি কেবলমাত্র বুদ্ধিগত থাকিলেই চলিবে না, বুদ্ধির ভূমি হইতে আনিয়া উহাকে তদনুরূপ আচরণে রূপদান করিতে হইবে। ইহাকেই বলিয়াছেন, "তৎপরঃ।" তৎপর শব্দের অর্থ শ্রীশঙ্কর বলিয়াছেন—"গুরূপাসনাদৌ অভিযুক্তঃ"। শ্রীধর বলিয়াছেন—"তৎপরস্তদেকনিষ্ঠঃ।" শ্রদ্ধার সহিত তন্ময়তা ও একনিষ্ঠতা।

পরম বস্তুতে চিত্তের একাগ্রতাই তৎপরতা—এক বস্তুতে স্থিতি একনিষ্ঠতা। একই বস্তুতে চিত্তের স্থিরতা সাধনের পক্ষে বাধা হইতেছে অন্য বস্তুর প্রতি আকর্ষণ। অন্য বস্তু হইতে চিত্তবৃত্তিকে সংহত করিতে না পারিলে একনিষ্ঠতাযুক্ত তৎপরতা সম্ভব নহে।

বহু বস্তুর প্রতি আকর্ষণ হইতে মনোবৃত্তিকে প্রত্যাহৃত করাই সংযতেন্দ্রিয়তা।

তৎপর ও সংযতেন্দ্রিয় এই দুইটি কথা আপাততঃ সম্পর্কহীন মনে হয়। বিশ্লেষণে দেখা যায়; এই দুই একই কার্যের এপিঠ ওপিঠ। এক বস্তুতে অনুগত হইতে হইলে তদিতর সকল বস্তু হইতে বিমুখ হইতে হইবে। পরমবস্তু ভিন্ন সকলের প্রতি বিমুখতাই আত্মসংযম।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের একটি বাণী আছে—"একান্ত ইচ্ছায় মানুষ সব পারে, ভগবদ্‌দর্শন পর্য্যন্ত হয়।" একটি বস্তু হইতেছে অন্ত বা প্রান্ত বা লক্ষ্যভূত বিষয় যে ইচ্ছার, তাহাই একান্ত ইচ্ছা। ইচ্ছাকে "একান্ত" করিতে হইলেই বহু হইতে তাহাকে সংযত করিতে হইবে। সুতরাং তৎপরতা ও আত্মসংযম মূলতঃ একই সাধনার দুই দিক্ মাত্র।

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিন বহিরঙ্গ সাধন এবং শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও সংযম এই তিন অন্তরঙ্গ সাধনের ফলে জ্ঞানলাভ হয়, এই কথা বলা হইল। কথাটি সম্পুর্ণ ঠিক হইল না, কেন না জ্ঞানবস্তু লাভ করা যায় না। উহা আত্মার স্বরূপধর্ম্ম, বাহির হইতে আমদানী করিবার জিনিস নহে।

পুষ্প যেমন প্রস্ফুটিত হয়, আত্মা সেইরূপ আপনা আপনি জ্ঞানলাভ করে—"আত্মনি বিন্দতি"—(৪।৩৮)। ঘট যেমন মৃত্তিকা হইতে জাত, চক্র, দণ্ড ও কুলাল সহকারী ও নিমিত্ত কারণ মাত্র, জ্ঞান বস্তুটি সেইরূপ আত্মারই বিকসিত রূপ, অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সাধনাদি সহকারী কারণ মাত্র। যোগদ্বারা সংসিদ্ধ

(যোগসংসিদ্ধঃ) অর্থাৎ সাধনার দ্বারা যোগ্যতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্বতঃ-সিদ্ধ জ্ঞান লাভ করেন। ("সংসিদ্ধঃ যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ"—শ্রীধর)।

জ্ঞানের ফল বলিয়াছেন তিনটি। (১) 'সর্ব্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে" – (৩৭)। (২) "জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সংতরিষ্যসি" – (৩৬)। (৩) "পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি" – (৩৯)। জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্ম ভস্মাৎ করে। জ্ঞান-তরণী অবলম্বনে পাপসমুদ্র পার হওয়া যায়। জ্ঞানলাভে পরা শান্তির প্রাপ্তি ঘটে।

কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের ত্রিবিধ স্থিতি – সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ। জ্ঞান অগ্নি-রূপে সঞ্চিত কর্ম্মরাশি দগ্ধ করিয়া ফেলে। জ্ঞান ভেলারূপে প্রারব্ধ, ক্রিয়মাণ কর্ম্মসাগর পার করিয়া দেয়। এসব জ্ঞানর গৌণফল। মুখ্য ফল হইল পরা শান্তি লাভ। শ্রীশঙ্কর বলেন, – "সম্যগ্‌দর্শনাৎ ক্ষিপ্রমেব মোক্ষঃ ভবতি" শ্রীধর আর একটু বিশ্লেষণ করিয়া বলেন – "জ্ঞানলাভাদনন্তরং তু ন তস্য কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যম্" – জ্ঞানলাভের পর আর কোন কর্ত্তব্য থাকে না – সুতরাং 'মোক্ষং প্রাপ্নোতি।" মোক্ষ – পরা শান্তি লাভ করে।

জ্ঞানের স্বরূপ, সাধন ও ফল বলা হইল। এবার জ্ঞানভ্রষ্ট বা সাধনভ্রষ্টের কথা কহিতেছেন। তিন শ্রেণীর লোক সাধনভ্রষ্ট হইয়া আত্মোন্নতি লাভে অক্ষম হয়। (১) জ্ঞানহীন (২) শ্রদ্ধাহীন ও (৩) সংশয়াত্মা – (৪।৪০)।

যাহার শাস্ত্রাদি জ্ঞান নাই, সেই অজ্ঞ। যে গুরু হইতে সদুপদেশ লাভ করে নাই, সেই অজ্ঞ। শ্রীধর বলিয়াছেন – "অজ্ঞো গুরূপদিষ্টার্থানভিজ্ঞঃ।" গুরুর সদুপদেশ পাইয়াও যে

বিশ্বাস করে না, বা তদনুসারে কার্য্য করে না, সেই শ্রদ্ধাবিহীন, অশ্রদ্দধান। "কথঞ্চিৎ জ্ঞানে জাতেঽপি তত্র অশ্রদ্দধানশ্চ।"

যাহার সকল বিষয়েই সংশয়—এইটা ঠিক, না ঐটা ঠিক—হয়ত এ পথ ঠিক নয়, ইত্যাদি প্রকার ভাবনাবিশিষ্ট, সেই সংশয়াত্মা। "জাতায়ামপি শ্রদ্ধায়াং মমেদং সিধ্যেন্নবেতি সংশয়াক্রান্তচিত্তঃ"—(শ্রীধর)। সংশয়াত্মা ব্যক্তির কোন বিষয়েতেই চিত্ত স্থিরনিশ্চয় নয়। এই তিন ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না।

এই তিনজনের মধ্যে অজ্ঞ ব্যক্তির দুর্ভাগ্য দূর হয় জ্ঞান লাভ হইলে। শ্রদ্ধাহীনের গতি হয়—কোন ভাগ্যে শ্রদ্ধা লাভ হইলে। কিন্তু সংশয়াত্মার ভাগ্যহীনতা কোন ক্রমেই দূর হয় না। তাই আচার্য্যেরা কহেন, অজ্ঞের মুক্তিলাভ সুসাধ্য, শ্রদ্ধাহীনের শান্তিলাভ যত্নসাধ্য, চেষ্টার ফলে শান্তি আসিতেও পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি সংশয়াত্মা, তাহার জীবনের পক্ষে শান্তিলাভ একরূপ অসাধ্য—"ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।" সুতরাং শঙ্কর বলেন—"সংশয়ো ন কর্ত্তব্যঃ।" অগাধ বিশ্বাস লইয়া সাধনপথে অগ্রসর হওয়া উচিত।

এগার

চতুর্থ অধ্যায়ের উপসংহার শ্লোক

চতুর্থ অধ্যায়ের উপসংহারের দুইটি শ্লোক। ইহাতে যেন একটু অন্য সুর। অবশ্য বক্তার কাছে নূতন কিছু নয়—তিনি তাঁহার প্রতিপাদ্য জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়ের কথা কহিয়াই চলিয়াছেন। শ্লোক দুইটির নূতনত্ব আছে। শ্রোতা অর্জ্জুন পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই একটি প্রশ্ন তুলিয়াছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে অন্যরূপ কথা আসিয়াছে বলিয়াই প্রশ্নটি তুলিয়াছেন।

যুদ্ধও কর, সন্ন্যাসও কর, ঈদৃশ ব্যামিশ্র উক্তিতে বিমূঢ় হইয়া অর্জ্জুন তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে যে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, এই আবার সেই পুরাতন প্রশ্ন। বক্তা ব্যামিশ্রতা এড়াইয়া সমাধানের পথে যাইতেছেন এরূপ মনে করিয়া অর্জ্জুন তৃতীয় অধ্যায় ও চতুর্থ অধ্যায় শুনিতেছিলেন। হঠাৎ আবার সেই পুরাতন ব্যামিশ্র উক্তি দেখিয়া অর্জ্জুন পুরাতন প্রশ্ন আবার উত্থাপন করিয়াছেন। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকোক্ত প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে চতুর্থ অধ্যায়ের উপসংহারের শ্লোক দুইটি বুঝিতে হইবে।

অর্জ্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ, তুমি কর্ম-ত্যাগ "কর্মণাং সন্ন্যাসং" করিবার কথা বলিয়াছ (শংসসি)। এখন আবার (পুনঃ) কর্মযোগের কথাও 'যোগঞ্চ' বলিতেছ; এই দুই বিপরীত কার্য্য এক ব্যক্তির পক্ষে একইকালে নিশ্চয়ই দুষ্কর।

নহে। এই দুই পথের মধ্যে যেটি আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ সেই একটি "তৎ একম্" নিশ্চয় করিয়া বল।

অর্জ্জুন এই জিজ্ঞাসাটি করিলেন কেন তাহা বিচার করিতে হইবে। "যোগায় যুজ্যস্ব"—(২।৫০) এবং "যুদ্ধায় যুজ্যস্ব" (২।৩৮)—যোগানুষ্ঠান কর, যুদ্ধানুষ্ঠান কর, এই আপাতবিরুদ্ধ উক্তি অবলম্বনেই অর্জ্জুনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভের প্রশ্ন। এ বিষয় পূর্ব্বে যথেষ্ট আলোচিত হইয়াছে।

প্রশ্নের উত্তর পাইবার আশায় অর্জ্জুন কান পাতিয়া আছেন। ভগবান্ বলিতেছেন,—অর্জ্জুন, দুই প্রকার নিষ্ঠার কথাই "দ্বিবিধ নিষ্ঠা" বলিয়াছি। একটি জ্ঞানযোগ, অপরটি কর্ম্মযোগ। এই কথা বলিয়া ভগবান্ কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। বহু বিশ্লেষণ করিয়া কর্ম্মকে আনিয়া যজ্ঞে দাঁড় করাইয়াছেন। যজ্ঞের মধ্যে জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। সর্ব্ব কর্ম্ম আসিয়া জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে—জ্ঞানে সর্ব্ব কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায়, একথাও কহিয়াছেন।

অর্জ্জুন আনন্দ-মনে শুনিতেছেন। জ্ঞান আর কর্ম্ম দুইটি পথ। তাহার মধ্যে একটি গিয়া আর একটিতে মিশিয়া গেল। কর্ম্ম আসিয়া জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করিল। দুই পথ এক হইয়া গেল। কৃষ্ণের বাক্যের ব্যামিশ্রতা কাটিয়া গেল। ইহা শ্রবণে অর্জ্জুনের পরম আনন্দলাভ করিবারই কথা।

চতুর্থ অধ্যায়ের চল্লিশ শ্লোক পর্য্যন্ত অর্জ্জুনের এই আনন্দ ব্যাহত হইবার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। কর্ম্মত্যাগের কথাই শুনিতেছেন। কর্ম্ম দগ্ধীভূত হয় এই কথাই শুনিয়াছেন।

পুনরায় কর্মযোগের কথা আবার শুনিলেন কখন? না শুনিলে "পুনর্যোগঞ্চ শংসসি" বলিয়া প্রশ্ন উঠাইলেন কি প্রকারে?

নিশ্চয়ই শেষের দুইটি শ্লোকের মধ্যে—(৪।৪১-৪২) এমন কথা শুনিয়াছেন, যাহাতে ঐরূপ প্রশ্নের উপযোগিতা বিদ্যমান আছে। বস্তুতঃ কথাটি আছে শেষের একটি শ্লোকে—(৪।৪২)। শ্লোকটির প্রারম্ভেই 'তস্মাৎ, কথাটি থাকায় আমরা দুইটি শ্লোককে যুক্ত করিয়া দেখিতেছি। 'তস্মাৎ' শব্দটি সাধারণতঃ কোন যুক্তির উপসংহারে প্রযুক্ত হয়। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে যুক্তির উপন্যাস ও পরবর্ত্তী শ্লোকে সিদ্ধান্ত স্থাপন। এই সিদ্ধান্তই অর্জ্জুনের প্রশ্নের জনক।

চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ কথাটি হইল--

"যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত।"

হে ভরতবংশাবতংস অর্জ্জুন, যোগমাতিষ্ঠ, কর্মযোগকে আশ্রয় কর। ("কর্মযোগমাতিষ্ঠাশ্রয়"—শ্রীধর)। উত্তিষ্ঠ—উঠ, প্রস্তুত হও। ("উত্তিষ্ঠ ইদানীং যুদ্ধায়"—শ্রীশঙ্কর) ("প্রস্তুতায় যুদ্ধায় উত্তিষ্ঠ"—শ্রীধর)।

কি আশ্চর্য্য! জ্ঞানাগ্নি কর্মকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল, তথাপি আবার যুদ্ধরূপ ঘোরতর কর্ম করিবার জন্য উঠিয়া বসিতে হইবে। এ কী হেঁয়ালি! অর্জ্জুনের মন চিন্তাচঞ্চল হইয়া উঠিল।

উপসংহারের "উত্তিষ্ঠ" শব্দই অর্জ্জুনকে চিন্তাব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। এতক্ষণ যাহা শুনিতেছিলেন তাহার উপর যেন একটি আঘাত আসিল। ভগবান্ তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইতে বলিলেন কোন্ যুক্তিতে? ইহাই জিজ্ঞাস্য।

হয় তো বা কোন যুক্তি নাই। যুক্তিবিচারের বাহিরে কঠোর আদেশ বাক্য? না, তাহাও নহে। বাক্যে বিন্দুমাত্র আদেশের গন্ধ নাই। নিজের "আত্মনঃ" জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা হৃদয়ের সংশয়কে ছেদন করিয়া "ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং" যুদ্ধ করিতে উঠিতে বলিতেছেন। যেন সংশয় কাটিয়া গেলে যুদ্ধ ছাড়া কোন বিকল্প উন্মুক্ত থাকিবে না!

সংশয়হীন ব্যক্তি লাভ করিবে জ্ঞান। জ্ঞানী হইলে থাকিবে না কর্ম—ইহাই তো এতক্ষণ বক্তৃতা করিলেন। একথার পরে সংশয়হীন হইয়া আবার যুদ্ধরূপ কর্ম করিতে বলা কী রকম শুনায়?

শ্রীমান্ অর্জ্জুন কত গভীর মনোযোগ সহকারে প্রিয়সখার বাক্যগুলি শ্রবণ করিতেছেন, তাহা এই প্রশ্ন হইতে অনুমান করিতে পারা যায়: শেষের "উত্তিষ্ঠ" শব্দটি অর্জ্জুনকে ভাবিত করিয়াছে। "উত্তিষ্ঠ" কথাটি না থাকিলে "যোগমাতিষ্ঠ" কথার যোগ শব্দকে জ্ঞানযোগ অর্থে চালাইবার চেষ্টা করা যাইত। 'উত্তিষ্ঠ' কথাটি এত পরিষ্কার ও কর্মযোগের দ্যোতক যে, জ্ঞান-কর্মের সমুচ্চয়বাদের বিরোধী আচার্য্য শঙ্কর পর্য্যন্ত "যোগমাতিষ্ঠ" ও "উত্তিষ্ঠ" পদদ্বয়ের কর্মযোগপর ব্যাখ্যা না করিয়া পারেন নাই। "যোগঃ" শব্দের অর্থ তিনি বলিয়াছেন, "সম্যগ্দর্শনোপায়ং কর্মানুষ্ঠানম্"—ভগবদ্দর্শন লাভের উপায়স্বরূপ কর্মসকল অনুষ্ঠান কর। ইহাতে জ্ঞানবাদীর কর্ম একটু মোলায়েম হইল বটে; কিন্তু "উত্তিষ্ঠ" পদের "যুদ্ধায়" ছাড়া অন্য কোন অর্থ করা শুদ্ধ জ্ঞানবাদী আচার্য্যের পক্ষেও সম্ভব হয় নাই।

সকল কর্ম জ্ঞানাগ্নিতে পোড়াইয়া আবার "উত্তিষ্ঠ" কথাটি

অর্জ্জুনের কানে ঠেকিবারই কথা। প্রশ্নটিতে অযথার্থ জিজ্ঞাসা কিছু নাই। তবে ভগবান্ এই কথা বলিলেন কেন, তাহাই বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কথাটি বলিবার কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে উল্লেখ করিয়া পরে "তস্মাৎ" শব্দের হেতুর সঙ্গে নিগমন বাক্যের একবাক্যতা রক্ষা করিয়াই কহিয়াছেন।

ভগবান্ বলিতেছেন—হে ধনঞ্জয়, কর্ম্মমাত্রই বন্ধনের কারণ—কর্ম্ম করিলেই বন্ধন হইবে এই সকল কথা সর্ব্বত্র ঠিক নয়। "ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি"—(৪।৪১) কর্ম্ম বন্ধন করিতে পারে না।

কীদৃশ ক্ষেত্রে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না—তাহা তিনটি বিশেষণে জানাইয়াছেন—"যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং, জ্ঞানসংচ্ছিন্ন সংশয়ম্, আত্মবন্তম্।" যিনি যোগদ্বারা কর্মসকল ভগবানে সমর্পণ করিয়াছেন (এখানে যোগ পদে সমত্ব—সুখ-দুঃখে লাভালাভে সমদৃষ্টি হইয়া), যিনি জ্ঞান দ্বারা সকল সংশয় ছেদন করিয়াছেন এবং যিনি আত্মবান্, তাঁহার কর্ম বন্ধনের হেতু নহে।

সমর্পিতকর্মা, ছিন্নসংশয়, আত্মবান্ জানীর কর্ম বন্ধন আনে না। সুতরাং হে অর্জ্জুন, তোমাকে ঐরূপ জ্ঞানবান্, ছিন্নসংশয়, আত্মবান্ হইয়া এই যুদ্ধকর্ম করিতে হইবে। অতএব পূর্ণজ্ঞানী হইয়া নিষ্কাম কর্ম কর। যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও। এই তো ভগবানের সহজ সরল যুক্তি।

অর্জ্জুন কি এই যুক্তিটি বুঝিতেছেন না? সত্য সত্যই বুঝিতেছেন না।—কেন বুঝিবেন? অর্জ্জুন ঐ শ্লোকের মধ্যে অন্য কথা শুনিতেছেন—ও মনে মনে প্রশ্ন তুলিয়াছেন।

জ্ঞানযোগে যাঁহার কর্মসকল সংন্যস্ত অর্থাৎ সম্যগ্‌ভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে, জ্ঞান দ্বারা যাঁহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, সেই আত্মবান্ পুরুষকে কর্মসকল বন্ধন করে না। কথাটি শুনিয়াই অর্জ্জুন মনে মনে চিন্তা করিয়াছেন—কর্ম যাঁহার নাই কর্ম তাঁহাকে বন্ধন করে না, একথা বলার তাৎপর্য্য কি? মাথা যাহার নাই তাহার মাথা ব্যথা কখনও হয় না—এ বৃথা বাক্য বলা কেন? অর্জ্জুন মনের কথা মুখে কিছু বলেন নাই। পরবর্ত্তী কথাটি অখণ্ড মনোযোগে শুনিতেছিলেন! যেই মাত্র শুনিলেন, তস্মাৎ উত্তিষ্ঠ —আর মুখ বুজিয়া থাকা সম্ভব হইল না। জিজ্ঞাসা করিলেন— "সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ" ইত্যাদি।

ভগবান্ বলিয়াছেন—যোগ দ্বারা (ফলাফলে সমত্ব-বুদ্ধি দ্বারা) যে ব্যক্তি বাসুদেবকে সর্ব্ব কর্ম সমর্পণ করিয়াছেন, জ্ঞানলাভে যাঁহার সংশয় কাটিয়া গিয়াছে, যিনি আত্মবান্, তিনিই নিষ্কাম কর্ম করিতে সক্ষম। অতএব অর্জ্জুন, তুমি তদ্রূপ হইয়া কর্মযোগ অবলম্বন করতঃ যুদ্ধ কর। জ্ঞানী হইয়া কর্ম কর। দু'য়ের সমুচ্চয়ে জীবন চালাও।

কথা শুনিয়া অর্জ্জুন ভাবিয়াছেন, জ্ঞানলাভে যাঁহার সংশয় গিয়াছে, কর্ম দগ্ধ হইয়াছে তাঁহার আর বন্ধনের প্রসঙ্গ কোথায়? সে আবার উঠিয়া ভারতসমরের জন্য প্রস্তুত হইবে কি করিয়া? ভগবান্ চাহেন জ্ঞানকর্মের অঙ্গাঙ্গি-মিলন। তাহা যে কিরূপে সম্ভব, অর্জ্জুন ধরিতে পারিতেছেন না। তাই তো জিজ্ঞাসা। ইহার উত্তর শুনিতে হইবে।

বার

পঞ্চম অধ্যায়

কর্ম্মসন্ন্যাস প্রকরণ

অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা লইয়া পঞ্চম অধ্যায় আরম্ভ। সেই পুরাতন প্রশ্নই অর্জ্জুন পুনর্ব্বার তুলিয়াছেন। একই কথা বারংবার শুনাইতেছেন কেন? উত্তর পাইতে পাইতে আবার গোলমাল লাগিয়া যাইতেছে, এই জন্য।

পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম প্রশ্নের বীজ যে চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ মন্ত্রে নিহিত আছে তাহা আলোচিত হইয়াছে। ভগবানের উক্তির মধ্যে একবার কর্মত্যাগের আর একবার কর্মযোগের সুর শ্রুত হইয়াছে। তাই দু'য়ের মধ্যে যেটি শ্রেয়স্কর সেইটি স্পষ্ট ভাষায় প্রশ্নকারী শুনিতে চাহেন উপদেষ্টার মুখ হইতে। তাই জিজ্ঞাসা।

অধ্যায় ভরিয়া প্রশ্নের উত্তর চলিয়াছে। মোট শ্লোক ঊনত্রিশটি। প্রথম মন্ত্রে প্রশ্ন। শেষমন্ত্রে নূতন সংবাদ। মধ্যবর্ত্তী সাতাইশটি মন্ত্রে নানাদিক্ হইতে প্রশ্নের উত্তর। এই সাতাইশটি মন্ত্রকে চারিটি প্রকরণে ভাগ করা চলে।

প্রথম এগারটি শ্লোক (২—১২) কর্মসন্ন্যাস-প্রকরণ। পরবর্ত্তী পাঁচটি (১৩—১৭) স্বভাব-প্রকরণ। শেষের নয় শ্লোক (১৮—২৬) সমদর্শন-প্রকরণ। পরবর্ত্তী দুই শ্লোক (২৭-২৮) ধ্যান-প্রকরণ। প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকরণগুলি আলোচনীয়। বিভিন্ন প্রকরণ-মধ্যে যোগসূত্রও লক্ষণীয়।

প্রশ্নটি উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভগবান্ অতি অল্প কথায় উত্তরটি দিয়াছেন। বলিয়াছেন, পথ দুইটিই বটে। দুইটিই কল্যাণপ্রদ। তন্মধ্যে সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভিক প্রশ্নের উত্তরে প্রায় একই ভাষা কহিয়াছেন। সেখানে বলিয়াছেন, ইহলোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা আছে। একটি সাংখ্যদের, অপরটি কর্মযোগীদের—(৩।৩)। এখানেও সেই দুই পথের কথাই। তবে নূতন এইটুকু যে, দুই পথই নিঃশ্রেয়সকর, এবং অর্জ্জুনের পক্ষে একটি অপেক্ষা অপরটি শ্রেয়ঃ।

এই সব কথা যেন হঠাৎ উল্টাইয়া দিতেছিল পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে—(৫।৪-৫)। হঠাৎ যেন বলিতেছিল পথ দুইটি নয়। যাহারা বালক তাহারা দুই পথ পৃথক্ দেখে। পণ্ডিতগণ সাংখ্য ও যোগকে এক বলিয়াই জানেন। দুই পথের গন্তব্য একই। একটি উত্তমরূপে ধরিলে উভয়ের ফললাভ হইবে—(৫।৪)।

পথ যদি একই, লক্ষ্য ও গন্তব্য যদি অভিন্নই, তাহা হইলে এতক্ষণ একাধিকবার দুই পথ দুই পথ বলিতেছিলেন কেন? এক নিঃশ্বাসেই পথ দুইটিও বলিবেন একটিও বলিবেন—এ কিরূপ উক্তি? বিচার করিয়া সমাধান করিতে হইবে।

"কর্মমাত্রই ত্যাজ্য", ইহা জ্ঞানী কর্ম-সন্ন্যাসীদের মত। "ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ"—(১৮।৩)। "নিয়ত কর্ম কর, কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম-করা শ্রেষ্ঠ" ইহা কর্মযোগী মীমাংসকদের মত। "নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ"—(৩।৮)। এই হইল দুই পথ, দ্বিবিধা নিষ্ঠা। কর্ম করার এক পথ, কর্ম না-করার অন্য পথ। দুই পথই কল্যাণদ

কহিয়াছেন। এ পর্যন্ত বেশ বোঝা গেল। আবার দুই পথকে এক পথ বলা কেন?

কর্ম-করা আর না-করা। এই দুইটি বিপরীত হইলেও তাহাদের মধ্যে একটি সাধারণ ধর্ম আছে। পথের দুই ফুটপাথ দুই বিপরীত প্রান্তে স্থিত হইলেও মধ্যবর্ত্তী রাজপথ একটিই।

কর্ম করিতে কর্ত্তৃত্ব লাগে। কর্ম না-করিতেও কর্ত্তৃত্ব লাগে। "করিব" বলাও অহংকার, "করিব-না" ভাবাও অহংকার। "যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে" (১৮।৫৯)। কর্ত্তৃত্বাভিমান লইয়া কর্ম করিলেও দোষ, না-করিলেও দোষ।

কর্ম করিলে ফলকামনা থাকে! কর্ম না-করিলেও না-করার ফলকামনা থাকে। ফলকামী ব্যক্তির কর্ম করিলেও দোষ হইবে—না-করিলেও দোষ হইবে।

গীতাকারের মত এই যে, কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া কর্ম করিলেও দোষ নাই, আর না-করিলেও দোষ নাই। কর্ম করিবে কিংবা করিবে না—ইহা নির্ভর করে ব্যক্তির স্বীয় প্রকৃতি বা স্বভাবের উপর। গীতায় বক্তার বক্তব্য এই যে, আপনি কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হউন। ইহাই প্রশস্ত রাজপথ। এই পথে থাকিয়া আপনি কর্ম-করার ফুটপাথ ঘেঁষিয়া চলেন কিংবা কর্ম না-করার ফুটপাথ ঘেঁষিয়া চলেন, কোনটিতেই আপত্তি নাই—দুইই "নিঃশ্রেয়সকরৌ"।

আপনি কোন্ ফুটপাথ ঘেঁষিবেন তাহা নির্দ্ধারণ করিবে আপনার স্বভাব। স্বভাব স্থির করিবে আপনার বর্ণ ও আশ্রম। আপনি ব্রাহ্মণস্বভাব হইলে যজ্ঞ তপস্যা করুন। আপনি সন্ন্যাসী

হইলে অনিকেত হইয়া তপশ্চর্যা করুন। আপনি গৃহাশ্রমী হইলে অগ্নিহোত্র দশকর্ম করুন।

আপন আপন স্বভাবানুরূপ কর্মে নিযুক্ত থাকিয়াই মানুষ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। "স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ" (১৮।৪৫)—যদি সে নিরহংকার ও নিষ্কামতার রাজপথ পরিত্যাগ না করে।

কর্ত্তৃত্বে অনাসক্তবুদ্ধি ও ফলে বিগতস্পৃহ হও, ইহাই গীতাকারের একমাত্র প্রশস্ত রাজপথ। ঐ পথের দুই কিনারা ধরিয়া চলিয়াছে দুই দল। একদল "নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং" পতাকাবাহী, অপর দল "ত্যাজ্যং দোষবৎ কর্ম"—এই পতাকা-ধারী। দুই দলই নিঃশ্রেয়স পাইবে, যদি রাজপথ ছাড়িয়া না যায়।

রাজপথের দুই দিকে অন্ধ গলি আছে। একদিকে শুধু কর্ম না-করার গলি, অপর দিকে শুধু কর্ম করার গলি। দুই পার্শ্ববর্ত্তী দুই সম্প্রদায়ই বিপদে পড়িবে, যদি তাহারা রাজপথ ছাড়িয়া কর্ম করা বা না-করার গলিতে ঢুকিয়া পড়ে।

যে ব্যক্তি নিরভিমান ও নিঃস্পৃহ না হইয়া "অযোগতঃ" কেবলমাত্র কর্ম না-করার গলিতে প্রবেশ করিবে, সে দুঃখই ভোগ করিবে "সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ—(৫।৬)।

যে ব্যক্তি কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনা লইয়া কেবলমাত্র কর্ম করার অন্ধগলিতে প্রবেশ করিবে সে (উপনিষদের ভাষায়) অবিদ্যা প্রভাবে অন্ধতমসে ডুবিয়া যাইবে। আর গীতার ভাষায়, সঙ্গ হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে সংমোহ, সংমোহ

হইতে স্মৃতিভ্রংশ এই কর্মচক্রের গোলক ধাঁধায় ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে "বিনশ্যতি", বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

গন্তব্যস্থল হইল দ্বন্দ্বাতীত ব্রহ্মভূমি। সেখানে পৌঁছিতে গেলে দ্বন্দ্বকে ছাড়াইতে হইবে। দ্বন্দ্বটী রহিয়াছে দুই স্থানে। বাহিরে কর্মের ভূমিতে, অন্তরে মানস ভূমিতে। যাঁহারা মনে করেন বাহিরের কর্মভূমির দ্বন্দ্ব এড়াইয়া গেলেই দ্বন্দ্বাতীতের সন্ধান পাওয়া যাইবে, গীতার বক্তা তাঁহাদের সঙ্গে একমত নহেন। গীতা বলেন যে, মানস-দ্বন্দ্ব অতিক্রম না করিয়া বাহিরের কর্মভূমির ত্যাগ একপ্রকার মিথ্যাচার (৩।৬)।

যিনি মানস-দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করেন, তাঁহার কাছে বাহিরের কর্মভূমির দ্বন্দ্বের কোন বিরুদ্ধতা থাকে না। সুতরাং তখন তাঁহার কর্মভূমিতে থাকা আর না-থাকা, দুইই সমান।

অন্তর্দ্বন্দ্ব হইল দুইটি—কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনা। এই দুইয়ের ঊর্দ্ধে যিনি উঠিয়াছেন, গীতা তাঁহাকে সাত্ত্বিক ত্যাগী বলিয়াছেন "সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ"—(১৮।৯)। মোহবশতঃ কর্মত্যাগ—তামসিক ত্যাগ। কায়ক্লেশ ভয়ে কর্মত্যাগ রাজসিক ত্যাগ—এই দুইটি ত্যাগপদ-বাচ্য নহে। ত্যাগের ফলও তাহারা লাভ করে না।

যিনি সাত্ত্বিক ত্যাগী তিনি মানস-দ্বন্দ্বের ঊর্দ্ধে বিরাজিত। বহির্জগতে কর্মভূমির কোন দ্বন্দ্ব তাঁহাকে উদ্বেগ দিতে পারে না। তিনি নির্দ্বন্দ্ব ব্রহ্মভূমির দিকে অবাধ গতিতে চলিবেন "যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি"—(৫।৬)।

কর্ম্ম করিয়াও যিনি নির্লিপ্ত, তিনি নিত্যসন্ন্যাসী—(৫।৩)।

শরীর মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়বর্গ এবং ইহাদের চেষ্টা-সকল যিনি দ্রষ্টার মত শুধু দেখেন, আপনি আসক্ত হন না, অভিনিবিষ্ট হন না—তিনিই সাত্ত্বিক ত্যাগী, কর্মযোগী। ত্যাগের ফল যে পরমা শান্তি, তাহা তিনি কর্ম করিয়াও লাভ করেন। "শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্"—(৫।১২)।

পক্ষান্তরে, ফলাসক্ত সকাম ব্যক্তি, কর্ম না করিলে হয় মিথ্যাচারী, কর্ম করিলে হয় বন্ধনগ্রস্ত—"ফলে সক্তো নিবধ্যতে"—(৫।১২)।

অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়কুমার, গৃহাশ্রমী। যুদ্ধ তাহার কর্ত্তব্য। যুদ্ধ করা তাহার প্রকৃতিগত। তদ্বিপরীত করিতে চেষ্টা করিলেও তাহা ব্যর্থ হইবে। প্রকৃতি স্বয়ং তাহাকে "নিযোক্ষ্যতি"। যুদ্ধকর্ম অর্জ্জুনের ধাতুগত, সংস্কারজ, স্বভাবজ। তাহার অন্যথা সে জোর করিয়াও করিতে পারিবে না।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥"
(১৮।৬০)

মোহবশতঃ তুমি যে যুদ্ধ করিবে না, ইচ্ছা করিতেছ, তোমার স্বভাবগত কর্মসংস্কারের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া অবশভাবে তাহা তোমাকে করিতেই হইবে।

সুতরাং অর্জ্জুনকে কর্ম করিতেই হইবে। করিতে হইবে অনাসক্ত হইয়া, নিষ্কাম থাকিয়া। অতএব অর্জ্জুনের পক্ষে কর্ম-ত্যাগের পথ অপেক্ষা অনাসক্ত হইয়া কর্মযোগের পথ ধরাই শ্রেষ্ঠ উপায় (বিশিষ্যতে)। কর্ম করিয়াও অনাসক্ত থাকা এক

রহস্যময় ব্যাপার। এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের চাবিকাঠি রহিয়াছে দুইটি তথ্যের উপর। (১) ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্ম্মাণি (৫।১০) (২) সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা। (৫।৭)।

ব্রহ্মে সমুদয় কর্ম্মের স্থাপন। যতদিন কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাসক্তি থাকে ততদিন কর্ম্ম স্থাপিত থাকে মিথ্যা অহংএর উপর। অজ্ঞানের স্থিতিও অহঙ্কারে।

জ্ঞানীর অহং অভিমান না থাকাতে তাঁহার সমুদয় কর্ম স্থাপিত হয় ব্রহ্মের উপর। অহং কর্ত্তা অভিমান যতদিন থাকে ততদিন নানাবিধ সংকল্প বিকল্প পাপ পুণ্য প্রভৃতির উদ্ভব হয়। মিথ্যা অহংটি যখন থাকে না, তখন দ্বন্দ্ব দূর হইয়া যায়। "সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা"—(৫।৭)—সমস্ত প্রাণীকে তিনি আপন আত্মা হইতে অভিন্ন দর্শন করেন। এই অভিন্ন দর্শন হয় সর্ব্বভূতের আত্মার আত্মা স্বরূপ পরমাত্মাকে জানিলে। যিনি ইহা জানিয়াছেন তিনিই পারেন আসক্তিহীন হইয়া কর্ত্তব্য করিতে। ব্রহ্মণ্যাধায় ও সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা, এই কথা দুইটির মধ্যে ভক্তিবাদের বীজ রহিয়াছে। কর্ম ও জ্ঞানের যাহা অসামঞ্জস্য; তাহার সুসমাধান হইবে ভক্তি দ্বারা। এই সত্য সূত্রাকারে উপস্থিত হইয়াছে ঐ দুইটি কথার মধ্যে।

৬ষ্ঠ

স্বভাব প্রকরণ

কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাসক্তি এই অন্তর্দ্বন্দ্ব দুইটি কোথা হইতে কি ভাবে জন্মিল এবং কি উপায়েই বা দূরীভূত হইতে পারে ইহা চিন্তনীয়।

জীবে চিৎ এবং অ-চিৎ এই দু'য়ের সমাবেশ আছে। চিদ্‌বস্তু হইল আত্মা বা দেহী। অচিৎ বা জড়বস্তু হইল দেহ। আত্মা নির্ব্বিকার, কর্তৃত্ব কর্মত্ব নাই। দেহ বিকারজ সুতরাং বিকারী, কর্তৃত্ব ও কর্মত্ব তাহার স্বভাব।

দেহ আর দেহী। অনাত্মা ও আত্মা। প্রকৃতি আর পুরুষ। এই দু'য়ের পরস্পরের সান্নিধ্যবশতঃ আত্মার চৈতন্য অনাত্মায় ও অনাত্মার কর্তৃত্ব আত্মায় সংক্রমিত হইয়াছে। যিনি বশী বা সংযমী পুরুষ তিনি দেহেন্দ্রিয়গুলি জয় করিয়া প্রকৃতির ঊর্ধ্বে বিরাজ করেন। তিনি নবদ্বারবিশিষ্ট দেহপুরে বাস করেন মাত্র। জানেন যে, তিনি কর্ত্তা নহেন। কর্ত্তা আমি নহি জানিয়া যিনি কর্ম করেন তিনি কর্মযোগী।

মানুষ জন্মে কতকগুলি জন্মান্তরের সংস্কার লইয়া। কর্তৃত্বা-ভিমান ও ফলকামনা, উহারা ঐ সংস্কারের অন্তর্গত। ঐ সংস্কারই কর্মের বীজ। ঐ সংস্কারটি জন্মিয়াছে দেহপ্রকৃতিতে। একটি ব্যাপার পুনঃ পুনঃ ঘটিতে ঘটিতে স্বভাব তৈয়ারী হয়। প্রকৃতির কর্তৃত্ব আত্মায় আরোপ ও তজ্জনিত সুখদুঃখ ফলভোগ জীবের স্বভাবে পরিণত হইয়া গিয়াছে। "স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে"—(৫।১৪)।

ঐ স্বভাবের মূলে রহিয়াছে কর্ম-বীজ বা কর্ম-সংস্কার। সংস্কারসমূহের সামগ্রিকভাবে পরিণত ফলই অহংকার। অহঙ্কারই অজ্ঞান। উহাই পাপ-পুণ্যের জনক ও বন্ধনের হেতু।

অহংকার আসলে জড়, কিন্তু চিদাত্মার সংযোগে চেতনবৎ প্রতীত হয়। পাপ-পুণ্যের অতীত আত্মা, অহংকারের সহিত যুক্ত হইয়া সুখদুঃখাদির ভোক্তা হয়। অহংকারকে যিনি জয় করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত ত্যাগী।

অহংকারকে জয় করিবার উপায় কি? প্রদীপটির প্রকাশ রাত্রের অন্ধকারেই। দিবালোকে সে নিষ্প্রভ। দেহাত্মজ্ঞানের নিশীথেই অহংকারের বাতি ঝলমল করে। আত্মজ্ঞানের সূর্য্যোদয় হইলে সে নিস্তেজ হইয়া যায়। "তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং"—(৫।১৬)। আত্মজ্ঞানই অহংকারকে হটাইয়া দেয়। আত্মজ্ঞানই অহংকার জয়ী। অতএব আত্মজ্ঞানীই প্রকৃত কর্মযোগী।

কর্ম্মসংস্কারের কথা বলা হইয়াছে। উহার স্থিতিস্থান স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, তিন দেহেই। এই সংস্কারসমূহই পাপবীজ বা কল্মষ। উহা তিন দেহ হইতেই সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত হইয়া গেলে তাহাকে বলা হয় "নির্ধূতকল্মষাঃ।" একমাত্র আত্মজ্ঞানের যজ্ঞাগ্নিতেই জীব "নির্ধূতকল্মষাঃ" হইতে পারে। "জ্ঞাননির্ধূত-কল্মষাঃ"—(৫।১৭)।

আত্মজ্ঞান লাভের উপায় কি? পরমাত্মার আলোতেই আত্মা আলোকিত হইয়া অনুভূত হয়। আত্মার যে জ্যোতি উহার মূলে পরমাত্মারই পরম জ্যোতিঃ। দেহের যেমন আত্মা, আত্মার তেমন পরমাত্মা। পরমাত্মাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট হইলে

"তদ্বুদ্ধয়ঃ", পরমাত্মাকেই আত্মার আত্মা বলিয়া জানিলে "তদাত্মানঃ", তাঁহাতেই একান্ত নিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিরভাবে স্থিতি হইলে "তন্নিষ্ঠাঃ", তাঁহাকেই পরমাগতি বলিয়া জানিলে "তৎপরায়ণাঃ"—(৫।১৭) তবেই আত্মজ্ঞানের সূর্য উদিত হয়।

পরমেশ্বরের সঙ্গে নিকট-সম্বন্ধের অনুভবেই প্রকৃত আত্মজ্ঞানী হওয়া যায়। প্রকৃত আত্মজ্ঞানীই প্রকৃত কর্ম্মযোগী। ঈশ্বরের সঙ্গে নিকটতম সম্বন্ধের বোধ জন্মে ভক্তিদ্বারে। সুতরাং জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় যে ভক্তিতে, ইহা ক্রমে ক্রমে উপস্থাপিত হইতেছে।

চৌদ্দ

সমদৃষ্টি-প্রকরণ

কর্ম্মের পরিসমাপ্তি জ্ঞানে একথা বলা হইয়াছে। জ্ঞানের পরিসমাপ্তি কর্ম্মে, এই কথা এখন বলিতেছেন। এই সমাপ্তিটি ঘটে সম্যগ্‌দর্শনের মাধ্যমে।

জ্ঞানী হইতে হইলে "সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা"—(৫।৭) হইতে হইবে। সর্ব্বভূতের আত্মভূত হইবে তাঁহার আত্মা। এইরূপটি হইলেই ইহার অপরিহার্য্য বহিঃপ্রকাশ হইবে সম্যগ্‌দর্শনে। এই দর্শনের পরিসমাপ্তি ভূতকল্যাণে।

সম্যগ্‌দর্শনই সমদর্শন। অন্তরে যে ব্যক্তি "তদাত্মা", বাহিরে সে সমদর্শী হইবেই। অন্তরটি যাঁহার তৎপরায়ণ, বাহিরটি তাঁহার "সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।" অন্তরে অনুভূতির একটি বহিরভিব্যক্তি থাকিবেই। যেমন জঠরে ক্ষুধার অভিব্যক্তি বাহিরে খাদ্যান্বেষণ, সেইরূপ পরমেশ্বরপরায়ণ (তৎপরায়ণঃ) যাঁহার আত্মা, তিনি সর্ব্বজীবের কল্যাণে নিযুক্ত থাকিবেনই।

জ্ঞানী হইলেই সর্ব্বত্র এক আত্মার দর্শন হইবে। পরমাত্মা ব্রহ্ম-বস্তুটি হইতেছেন সম ও নির্দ্দোষ "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম"—(৫।১৯)। সুতরাং ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তির বহিঃপ্রকাশই হইবে সমদর্শিতা ও অদোষদর্শিতা। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গাভী, হস্তী, কুকুর বিড়াল সকলকেই আত্মবিৎ আত্মস্বরূপ দর্শন করেন, "পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ"—(৫।১৮)। অদোষদর্শী বলিয়াই তাঁহারা প্রিয়লাভে হৃষ্ট, অপ্রিয়লাভে রুষ্ট হন না—(৫।২০)।

এক পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র দর্শন ও সেই পরমাত্মার সঙ্গে নিজের আত্মার একপ্রাণতার বোধ যাঁহার হইয়াছে তিনিই "বিদিতাত্মা"—(৫।২৬)। সেই ব্যক্তির একমাত্র কর্ম্ম হইল সর্ব্বভূতের কল্যাণ-সাধন। এই কার্য্য তখন তাঁহার স্বতঃ প্রণোদিত—স্বাভাবিক। ফুল যেমন গন্ধ ছড়ায়, ব্রহ্মে স্থিত "ব্রহ্মবিৎ"—(৫।২০), সেইরূপ কল্যাণ ছড়ান। যিনি ব্রহ্ম-নির্ব্বাণের মধ্যেই বাস করেন "অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং"—(৫।২৬), তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাস মহামঙ্গল বহন করে।

অভাবই আকাঙ্ক্ষার জনক। সুতরাং অপূর্ণ ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা থাকিবেই। যিনি "ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা"—(৫।২১), তিনি তো অপরিণামী অক্ষয় সুখসাগরে ভাসিতে থাকেন "সুখমক্ষয়মশ্নুতে" —(৫।২১)। তিনি আর ফলাকাঙ্ক্ষা করিবেন কেন ?

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগে যে সাময়িক ভোগ "সংস্পর্শজা ভোগাঃ"—(৫।২২) তাহাতে যিনি মজিয়া থাকেন তিনি কেবল দুঃখই লাভ করেন। কারণ ঐ ভোগ দুঃখের জনক (দুঃখযোনয়ঃ) ঐ ভোগ "আদ্যন্তবন্তঃ," উহার আরম্ভ ও শেষ আছে। ঐ সুখ অতি তুচ্ছ। ঐ সুখে যাহারা ডুবিয়া থাকে তাহারা অপূর্ণ। তাহারা নিরন্তরই লুব্ধ। ফলকামনা তাহাদের কদাপি ঘুচে না। সুতরাং ইন্দ্রিয়ারাম ব্যক্তি কখনও কর্ম্মযোগী হয় না। আত্মা-রামই কর্ম্মযোগী হইতে পারেন।

আত্মারামের কোন কার্য নাই ইহা বলা হইয়াছে—(৩।১৭)। আবার আত্মারামই কর্ম্মযোগী এই কথা বলা হইতেছে। অতএব কর্ম যাঁহার নাই, সে-ই প্রকৃত কর্ম্মযোগী। বিষয়-

কামনা থাকিলেই চিত্তে কাম থাকে। কাম থাকিলেই ক্রোধ থাকে। এই দুই থাকিলে মানুষ ত্যাগী হইতে পারে না। কর্ম্ম-ত্যাগী সন্ন্যাসীদের যদি এই দুই রিপুবেগ থাকে তাহাকে মিথ্যাচারী বলিব। আর কর্ম্মের মধ্যে এই সংসারে, "ইহৈব"—(৫।৩৯) থাকিয়াই যে ব্যক্তি কামক্রোধজ বেগ প্রতিরোধ করিতে পারে—(৬।২৩) তাহাকেই "যুক্ত" বলিব। সে নিশ্চয়ই ব্রহ্মবস্তুর সঙ্গে যুক্ত এবং যুক্ত বলিয়াই অক্ষয় সুখে সুখী, "স যুক্তঃ স সুখী নরঃ"—(৫।২৩)। ঈশ্বরকামনা প্রবল হইলে ভোগকামনা দূর হয়। বাহিরের অশেষবিধ বিষয়-সুখ ত্যাগ করা তখনই সম্ভব, যখন অন্তরে আনন্দবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। অন্তরে যিনি পরম বস্তুর আস্বাদন পাইয়াছেন, গীতা তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন তিনটি বিশেষণে। "অন্তঃসুখঃ, অন্তরারামঃ, অন্তর্জ্যোতিঃ"—(৫।২৪)।

যাঁহার সুখের সামগ্রী অন্তরে—অন্তরাত্মায় ভগবানে, বাহিরের বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগে নহে, তিনি অন্তঃসুখ। যাঁহার ক্রীড়া অন্তরে, অন্তরের দেবতার সঙ্গে, বাহিরের কাহারও সঙ্গে নহে, তিনি অন্তরারাম। যাঁহার জীবনপথের আলো অন্তরচারী দেবতার করুণাপ্রসাদ, তিনি অন্তর্জ্যোতিঃ।

এই আন্তর-সম্পত্তি রহিয়াছে যাঁহার হৃদয়রাজ্যে, তাঁহার বহিঃপ্রকাশ থাকিবে কল্যাণময় কর্ম্মে। গগনে মেঘ ঘন হইলে ভূমিও বর্ষণে সিক্ত হইবে। বৃক্ষলতাদির পরিপূর্ণতার বহিরভি-ব্যক্তি যেমন ফুলে ফলে, ঐ আন্তরসম্পত্তিশালী ব্যক্তির বহিঃ-প্রকাশ সেইরূপ সর্ব্বভূতের হিতজনক কর্ম্মে—(৫।২৫)।

বীজ যেমন বৃক্ষ জন্মাইয়া সার্থক হয়, কর্ম্ম তেমনি জ্ঞানকে

পাওয়াইয়া দিয়া ধন্য হয়। আবার বৃক্ষ যেমন নিজ পক্কফলে বীজকে জন্মাইয়া বৃক্ষজীবন পূর্ণ করে, জ্ঞানও সেইরূপ ভক্তিময় জীবনের পথে জীবকল্যাণদ কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া আত্মার পূর্ণতায় পূর্ণসুখ আস্বাদন করে। কর্ম্ম ও জ্ঞান দুইটি অঙ্গ—মাঝে অঙ্গী হইতেছেন ভক্তিদেবী। গীতার আরাধ্যাদেবীর কাঠামোখানি এই সবেমাত্র আত্মপ্রকাশ করিল। ক্রমে পূর্ণাঙ্গ হইলে ইহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে।

পনের

ধ্যান প্রকরণ

আরাধ্যাদেবীর প্রতিমা পাইলেই ধ্যানে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে। ষষ্ঠ অধ্যায়টি মুখ্যতঃ ধ্যানের কথা লইয়া। পঞ্চম অধ্যায়ের দুইটি শ্লোকে—(২৭-২৮) পরবর্ত্তী অধ্যায়ের সূচনা হইতেছে।

কর্ম্মী ব্যক্তি জ্ঞানী হইবেন যজ্ঞভূমিকায় গিয়া। জ্ঞানী ব্যক্তি আবার কর্ম্মী হইবেন ভক্তিভূমিকায় উঠিয়া ভক্তিদেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইয়া। (৫।১৭) শ্লোকে "তদ্‌বুদ্ধয়ঃ, তদাত্মানঃ, তন্নিষ্ঠাঃ, তৎপরায়ণাঃ"—এই কয়টি পদের আড়াল দিয়া ভক্তিদেবী ধীরে ধীরে প্রকাশিতা হইতেছেন। 'তৎ'বস্তুর সঙ্গে যুক্ততাতেই ভক্তিরাণীর প্রথম পাদপীঠ রচনা।

পরাৎপর বস্তুর সঙ্গে যুক্ততা। ইহার দুইটি অবস্থা; একটি সর্ব্বকালীন অবস্থা, অপরটি বিশিষ্টকালীন অবস্থা। হৃদয়ে একটা স্থায়ী অনুরাগ লইয়া সকল সময়ের জন্য তাঁহাকে স্মরণে রাখা; সকল কাজের মধ্যে তাঁহাকে মনে রাখা "মামনুস্মর যুধ্য চ," ইহা হইল যুক্ততার সর্ব্বকালীন অবস্থা।

বিশিষ্টকালীন বিশেষভাবে যুক্ততা হইল সাময়িক ব্যাপার কিন্তু তাহার ফল অন্তররাজ্যের গভীর আলোড়ন। এই মিলনটি ঘটে ধ্যানের বাসর-ঘরে। মিলন-বাসরে যাইবার নেপথ্য-বিধানটি পূর্ব্বাহ্ণে বলিতেছেন।

বাহ্যবিষয় হইতে মনোরত্নটিকে উদ্ধার করতঃ চক্ষু দুইটিকে ভ্রূর মধ্যে রাখিয়া, প্রাণাপান বায়ুর গতি সমান করিয়া নাসামধ্যে স্থাপন করিয়া, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিকে সংযত রাখিয়া, ইচ্ছা ভয় ক্রোধ বর্জ্জন পূর্ব্বক মোক্ষপরায়ণ মুনি যুক্ত হইয়া মুক্ত হইবেন।

এইভাবে প্রতিদিন দিনান্তে একটিবার যদি বৃহদ্বস্তু ব্রহ্মেতে ক্ষুদ্র অহংএর সত্তাকে নির্ব্বাণ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত দিনের সমস্ত জীবনের যোগযুক্ততা সার্থক হইয়া উঠে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যান-মিলনের কথা বিশেষ করিয়া কহিবেন। এই অধ্যায়ের দুই শ্লোকে দিগ্দর্শনমাত্র।

ষোল

পঞ্চম অধ্যায়ের উপসংহার

পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে একটি অভিনব সন্দেশ আছে। এই পর্যন্ত জ্ঞান কর্ম্মের কথা চলিতেছে। তাহাদের মধ্যে অসামঞ্জস্যগুলি বারংবার আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ভক্তিদেবী এখন পর্যন্ত অন্তঃপুরচারিণী। এই অধ্যায়ে কয়েকবার তিনি অবগুণ্ঠনের বাহিরে আসিতে চেষ্টাপরায়ণা হইয়াছেন। এইবার উপসংহার শ্লোকে হঠাৎ তিনি সদরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। করিয়াই আবার তাড়াতাড়ি লুকাইয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বে জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুই স্তম্ভের উপরে ভক্তিকে তোরণরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এই শ্লোকে সহসা যেন তোরণের নমুনাটি দেখাইয়া দিলেন। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় যেন অর্জ্জুন একটিবার দেখিলেন। এই দেখার পর আর সংশয়াত্মক প্রশ্ন তোলেন নাই।

একাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জ্জুন বলিয়াছেন যে, তাঁহার মোহ কাটিয়া গিয়াছে—(১১।১)। ইহাতে বুঝা যায় যে—(৫—১০) এই ছয়টি অধ্যায়ে যাহা শুনিয়াছেন তাহাতেই মোহশূন্য হইয়াছেন। এই ছয় অধ্যায়ে অর্জ্জুন যাহা পাইবেন পঞ্চম অধ্যায়ের উপসংহার শ্লোক তাহারই যেন একটি প্রতি-লিপিকা। অধুনাকালে অট্টালিকাদি নির্ম্মাণে শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্র হইতেই পূর্ব্বাহ্নে যেমন ভাবী অট্টালিকার আকৃতি মানস-নেত্রে ভাসিয়া উঠে, তদ্রূপ এই শ্লোকে ছয়টি অধ্যায়ে প্রকাশিতব্য তত্ত্বের আন্তর রূপটি ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে।

শ্লোকটিতে বলিয়াছেন একটিমাত্র তথ্য—অর্জ্জুন, আমাকে সর্ব্বভূতের সুহৃদ্ বলিয়া জান, তাহা হইলেই শান্তিলাভ করিবে। নিজের আরো দুইটি পরিচয় দিয়াছেন "সকল যজ্ঞ-তপস্যার ভোক্তা" ও "সকল লোকের মহেশ্বর।" তিনি সর্ব্ব কর্ম্মের ফলভোক্তা ও মূলকর্ত্তা। যিনি পরমেশ্বর, পরম ভর্ত্তা ও পরম ভোক্তা, তিনি আমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধু—ইহা জানিলেই শান্তি।

লৌকিকেও কোন বড় ব্যক্তির সৌহার্দ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান থাকিলে লোকে অনেক বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। আর সকল বিশ্বের মহেশ্বর যিনি তিনি সুহৃদ্, পরম বন্ধু। তিনি কখনও অকল্যাণ করিতে পারেন না, নিয়ত মঙ্গলই তাঁহার কার্য—ইহা যদি কেহ অন্তর দিয়া বিশ্বাস করে, তবে তাহার আর ভাবনার কী থাকিতে পারে ?

জাগতিক কোন সুহৃদের উপরেই সর্ব্বতোভাবে আস্থা স্থাপন করা চলে না। কেন না, কোন সুহৃদ্ হয়ত যথেষ্ট স্নেহশীল কিন্তু তাহার সামর্থ্য হয়ত অতি অল্প। সমবেদনা আছে কিন্তু কিছু করিবার সামর্থ্য নাই তাহার। আবার কোন সুহৃদ্ হয়ত যথেষ্ট সামর্থ্যবিশিষ্ট কিন্তু হৃদয়ে প্রীতির গভীরতা নাই। অনেক কিছু কল্যাণ করিতে পারে, কিন্তু প্রাণ নাই, তেমন প্রীতি নাই।

এমন একজন সুহৃদ্ যদি মিলে, যিনি অসীম শক্তিশালী ও অপরিসীম স্নেহপূর্ণ, তবেই না নিশ্চিন্ত মনে তাঁহার আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া শান্তিতে থাকা যায়! গীতা এই শ্লোকে সংবাদ দিয়াছেন যে, সেইরূপ একটি ব্যক্তি আছেন যিনি শক্তিতে সর্ব্বলোক-মহেশ্বর, যিনি স্নেহে সর্ব্বভূতের সুহৃদ্। তাঁহাকে আপনজন

বলিয়া ভালবাসিলেই ভক্তি সিদ্ধ হইল। তাঁহাকে যজ্ঞ-তপস্যার ভোক্তা বলিয়া জানিয়া, তদুদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিলেই কর্ম্ম সিদ্ধ হইল। কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় মিলিল—কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, সত্যাবগতি ও রসানুভূতি এই তিনের সামঞ্জস্য হইল। একটি শ্লোক-দর্পণে সমগ্র গ্রন্থ দেখা গেল।

সতের

ষষ্ঠ অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম ধ্যানযোগ। এই অধ্যায়ের মূল বক্তব্য ধ্যানযোগ। ধ্যানযোগকে কর্ম্মাঙ্গও বলা চলে, জ্ঞানাঙ্গও বলা চলে। ধ্যানের সাধনে কতকগুলি করণীয় কর্ম্ম আছে, সুতরাং ইহাকে কর্ম্মযোগ বলা যায়। আবার জ্ঞানযোগে যে ব্রহ্মবস্তুর সন্ধান, ধ্যানে তাহারই বিশেষ সান্নিধ্য লাভ। সুতরাং ইহাকে জ্ঞানযোগও বলা যায়। ধ্যানযোগ দ্বারাই কর্ম্ম ও জ্ঞানের মিলন। এই কথাটা বলিবার জন্যই প্রথম নয়টি শ্লোকে ধ্যানযোগের ভূমিকা। এই ভূমিকাকে যোগারূঢ়-প্রকরণ বলা হয়।

পরবর্ত্তী তেইশটি শ্লোকে (১০—৩২) ধ্যানপ্রকরণ। প্রকরণের প্রথমাংশে (১০—২৬) ধ্যানসাধনের কথা। শেষ ভাগের ছয়টি (২৭—৩২) শ্লোকে ধ্যানফলের কথা। সাধনের দিকে দৃষ্টি করিলে ধ্যান কতিপয় কর্ম্মবিশেষ—"যুক্তচেষ্টস্য

কর্ম্মসু”—(৬।১৭)। যখন সাধক ধ্যানযোগে আরোহণেচ্ছু "আরুরুক্ষোঃ মুনেঃ যোগম্", তখন তিনি কর্ম্মযোগীই। কর্ম্মই তখন তাঁহার অবলম্বনীয়—"কর্ম্ম কারণমুচ্যতে" (৬।৩)। আর আরোহণ করিলে পরে, যোগারূঢ় বা যোগসিদ্ধ হইলে পরে, শমই ঐ নিশ্চল স্থিতিতে থাকিবার কারণ—"শমঃ কারণমুচ্যতে" (৬।৩)।

সুতরাং ধ্যানযোগের প্রথম ভাগটা কর্ম্মযোগ, শেষ ভাগটা জ্ঞানযোগ। বিদ্যার্থী ছাত্রের যেমন প্রথম ভাগটা স্কুলের খাটুনি, শেষ ভাগটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা শোনা। বিদ্যা উপার্জ্জনের ভূমি, এই দৃষ্টিতে যেমন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় একই—সেইরূপ "সকল সঙ্কল্পের ত্যাগভূমি" (সর্ব্বসংকল্প-সন্ন্যাসী), এই দৃষ্টিকোণ হইতে যোগী, জ্ঞানী, সন্ন্যাসী, ধ্যানী, যোগারূঢ় সকলই এক ভূমিকায়।

অসংন্যস্তসংকল্প যিনি,—"ন হি অসংন্যস্তসংকল্পঃ"—(৬।২), তিনি কর্ম্মযোগীও নহেন—সন্ন্যাসীও নহেন। কর্ম্ম করিলেই কর্ম্মযোগী হয় না, কর্ম্ম ছাড়িলেই সন্ন্যাসী হয় না। যোগাভ্যাস করিলেই যোগারূঢ় হয় না। কর্ম্মের সংকল্প ত্যাগই কর্ম্মযোগ, সংকল্পত্যাগই সন্ন্যাস, সর্ব্বসংকল্প-সন্ন্যাসীই যোগারূঢ় (৬।৪)।

কর্ত্তৃত্বাভিমানও একটি কামনা। ফলাকাঙ্ক্ষাও একটি কামনা। আর এই কামনার মূলে আছে সংকল্প,—"সংকল্প-প্রভবান্ কামান্"—(৬।২৪)। স্মৃতিশাস্ত্রে আছে,—

"কাম জানামি তে মূলং সংকল্পাৎ ত্বং হি জায়সে।
ন ত্বাং সংকল্পয়িষ্যামি তেন মে ন ভবিষ্যসি ॥"

হে কাম, আমি তোমার মূল কারণ জানিয়াছি। তুমি সংকল্প

হইতে উৎপন্ন হও। তোমাকে আর সংকল্পের বিষয় করিব না। তাহা হইলে তুমি আমার হৃদয়ে উৎপন্ন হইতে পারিবে না।

সংকল্পশূন্যতার ভাষায় ধ্যানযোগের পথটার প্রথম ভাগ ও শেষ ভাগের কথা আর একবার বলি। যিনি ধ্যানমার্গে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তিনি কামনাহীন হইয়া কর্ম্ম করিবেন। আর তিনি যখন ঊর্দ্ধভূমিতে আরোহণ করিয়াছেন তখন তিনি সংকল্পশূন্যতাবশতঃ শান্ত হইয়া যাইবেন—(৬।৩-৪)।

নির্ম্মল আত্মা, মলিন সংকল্প করিতে করিতে বিষয়-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। আত্মাকে সংকল্পশূন্য করিয়া বিষয়-বিমুক্ত করিতে হইবে। বিমুক্ত মন দ্বারা বিমূঢ় মনকে উপরে টানিয়া তুলিতে হইবে। এই নিম্নমুখী আত্মাকে ঊর্দ্ধমুখী করাই যোগসাধনা—"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং"—(৬।৫)। মনের খানিকটা অংশ ঊর্দ্ধে উঠিলেও খানিকটা নীচুতে পড়িয়া থাকে। সবটাকে তুলিয়া নিয়া সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী হইতে পারিলে যোগারূঢ় হওয়া যায়। যোগারূঢ়, যোগসিদ্ধ যোগীকে গীতা—"যুক্তযোগী" বলিয়াছেন—(৬।৮)।

তিন শ্লোকে—(৬।৭-৯) যুক্তযোগীর লক্ষণ বলিয়াছেন। গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশ দ্বারা যাঁহার বুদ্ধি নির্ম্মল, সত্যের অপরোক্ষ অনুভূতি দ্বারা যাঁহার চিত্ত তৃপ্ত, যিনি নির্ব্বিকার, জিতেন্দ্রিয়, মাটির ঢেলা আর স্বর্ণখণ্ডে যাঁহার সমান দৃষ্টি, শত্রু মিত্রে একই বুদ্ধি, তিনি যোগারূঢ়।

এই পর্যন্ত যোগারূঢ়-প্রকরণ। এই ভূমিতে আরোহণ করিতে হইলে চাই নিরন্তর পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত থাকা। নিরন্তর

তো থাকা চাই-ই, আবার বিশেষভাবে, দিনে রাত্রে বিশেষ সময় তাঁহার সান্নিধ্য অনুসন্ধান করা প্রয়োজন—তাহাই ধ্যানযোগ। তাহার উপায় কী, পরবর্ত্তী প্রকরণে বলিতেছেন।

ধ্যানযোগে সিদ্ধ বা যুক্তযোগী হইতে হইলে কি কি করা প্রয়োজন তাহার সংক্ষিপ্ত নির্ঘণ্ট প্রদত্ত হইতেছে ঃ—

১। নির্জ্জন স্থানে ধ্যানে বসিবে (রহসি স্থিতঃ)।

২। একাকী ধ্যান করাই বিধেয় (একাকী)।

৩। পবিত্র স্থানে ধ্যানের আসন করিবে (শুচৌ দেশে)।

৪। আসনে উপবেশন করিবে। আসন বেশী উঁচু বা বেশী নীচু হইবে না। কুশ, চর্ম্ম ও বস্ত্র পাতা প্রশস্ত—(৬।১৩)।

৫। মস্তক ও গ্রীবা সরল ও নিশ্চল রহিবে—"সমং কায়শিরোগ্রীবং—(৬।১৩)।

৬। নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখিবে—(৬।১৩)।

৭। এদিক্ ওদিক্ তাকাইবে না। "দিশশ্চানবলোকয়ন্" —(৬।১৩)।

৮। অতি আহার করিবে না, অনাহারেও থাকিবে না—(৬।১৬)।

৯। অতি নিদ্রা যাইবে না, আর অতি জাগরণও উচিত নহে—(৬।১৬)।

১০। কাজকর্ম্ম বন্ধ থাকিবে না—সবই করিবে, কিন্তু পরিমিত-ভাবে "যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু"—(৬।১৭)।

এই দশটি নিয়ম শরীর সম্পর্কে। অতঃপর মানসিক স্থিতির কথা বলিতেছেন।

১১। বায়ুহীন স্থানে কম্পনহীন প্রদীপের শিখাটির মত চিত্ত স্থির ও সংযত রহিবে, "যথা দীপো নিবাতস্থঃ"—(৬।১৯)।

১২। মন দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয়-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিবে—"বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া"—(৬।২৫)। চক্ষু যে দেখে, সে মনের অধীন, মনোযোগ না হইলে দেখে না। মন দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযমের ইহাই তাৎপর্য্য।

১৩। সর্ব্ববিধ কামনা ও সংকল্পশূন্য হইবে—"সংকল্পপ্রভবান্ কামান্ ত্যক্ত্বা সর্ব্বান্"—(৬।২৪)।

১৪। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল। অস্থির হইয়া মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হয় সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে হইবে। ইহাই প্রত্যাহার—(৬।২৬)।

১৫। কোন কিছুই চিন্তা করিবে না। "ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ"—(৬।২৫)। চিন্তাটা মনের ধর্ম্ম। যতক্ষণ চিন্তা আছে ততক্ষণ মন আছে। চিন্তাশূন্য হইলে মন লয় হইল। চিত্তকে চিন্তাহীন, একেবারে বিষয়হীন করিলে সেথায় ইষ্টের প্রকাশ ঘটিবে।

এই ধ্যানরূপ কর্ম্ম বা ক্রিয়াযোগের ফলে উপস্থিত হইবে একটি কর্ম্মহীন প্রশান্ত অবস্থা, গভীর সুখানুভূতি। ঐ সুখটি "ব্রহ্মসংস্পর্শ"। এই অবস্থাটির মধ্যে কিছু অবগতি নাই—জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান একীভূত। আছে একটা নিবিড় আনন্দানুভূতি—ঐটি প্রিয়তমের অনুভবসুখ।

কর্ম্মের গতি ও জ্ঞানের অবগতি লয় হইয়া যায় একটা

রসের অনুভূতিতে। এইটি ধ্যানের তৎকালীন পরম ফল। জীবনের মধ্যে ঐ ধ্যানফলের স্থায়ী লাভ হইল একটি দৃষ্টিভঙ্গী।

যুক্তযোগী তখন সমদর্শী হইয়া আত্মাকে সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করিয়া থাকেন—"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং" —(৬।২৯)।

প্রিয়ের ঐ স্পর্শসুখে যুক্তযোগী তখন ভক্ত হইয়া যান। তিনি তখন প্রাণপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখেন— "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" আবার শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বভূতের অবস্থিতি দর্শন করেন। "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি"—(৬।৩০)।

এই প্রকার ভক্তের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণ কখনও অদৃশ্য হন না, "তস্যাহং ন প্রণশ্যামি"—(৬।৩০)। নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে ভক্ত ও ভগবান্ দুইজন দুই জনকে দেখিতে থাকেন। নিমেষহীন নয়নের তৃপ্তি আর হয় না। ভগবদ্দর্শনে ভক্তের আনন্দ, ভক্তদর্শনেও ভগবানের আনন্দোদয় হইয়া থাকে। ভক্তিরাজ্যের এই অভিনব বার্ত্তা।

এইরূপ যুক্ত ভক্তযোগীর ব্যবহারিক সামাজিক জীবনটি তখন কি প্রকার হয় তাহাই বলিতেছেন। এই ভক্ত একত্বে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ আছেন এই অনুভবে স্থিত হইয়া, সর্ব্বভূতস্থ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন "সর্ব্বভূতস্থিতং···মাং ভজতি" (৬।৩১)। অর্থাৎ সর্ব্বভূতে প্রিয় আছেন দেখিয়া সর্ব্বভূতকেই পরম প্রীতি করিয়া থাকেন।

ঈশ্বরপ্রীতির ফলস্বরূপ তাঁহার হৃদয়ে তখন জীবপ্রেমের উদয়

হয়। প্রেমযুক্ত বলিয়াই জীবের জন্য তাঁহার নিষ্কাম কর্ম্ম করা সম্ভব হয়। কর্ম্মে তিনি তখন "মৎকর্ম্মকৃৎ" (১১।৫৫), জ্ঞানে "মদ্ভাবমাগতাঃ" (৪।১০), ভক্তিতে "মদ্গতপ্রাণাঃ" (১০।৯), সর্ব্বদাই "সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ" (৫।২৫)।

আঠার

মনঃসংযম-প্রকরণ

অতঃপর আর দুইটি ছোট প্রকরণ। মনঃসংযম-প্রকরণ (৩৩—৩৬) ও যোগভ্রষ্ট-প্রকরণ (৩৭—৪৪) উভয় প্রকরণই অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা লইয়া প্রবৃত্ত। প্রশ্ন দুইটি অর্জ্জুনের মুখে, কিন্তু উহা জানা প্রয়োজন সকল মানুষেরই।

অর্জ্জুন পরম যোগের কথা শ্রবণ করিলেন। যাহা শুনিলেন তাহাতে বুঝিলেন যে সমদর্শনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদ, "যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন" (৬।৩৩)। ঐ সমত্ব-বুদ্ধিতে স্থিত হইতে হইলে মনের প্রশান্ততা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু মন নিরন্তর এত চঞ্চল যে, সমদর্শনে স্থিত হওয়া যেন প্রায় অসম্ভব মনে হয়। "ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্" (৬।৩৩)।

মন স্বভাবতঃ চঞ্চল ও ইন্দ্রিয়বিক্ষোভকারী (প্রমাথি)। অর্জ্জুন বলিতেছেন যে, বায়ুর বেগকে ঠেকাইয়া রাখা যেরূপ

দুঃসাধ্য (সুদুষ্কর), মনকে নিরোধ করাও তদ্রূপ সুদুষ্কর কার্য্য মনে হয়।

অর্জ্জুনের কথাটি পার্থসারথি সম্পূর্ণভাবেই মানিয়া লইলেন। মন যে চঞ্চল ও দুর্নিরোধ ইহাতে কোন সংশয়ই নাই (অসংশয়ং), তথাপি সাধনপথে অগ্রসর হইতে গেলে এই দুর্নিবার মনকে বশীকৃত করিতেই হইবে। করিবার উপায়ও আছে। দুইটি উপায় বলিতেছেন—

অভ্যাস এবং বৈরাগ্য এই দুই উপায়ে, অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ—(৬।৩৫) মনকে নিগৃহীত করিতে হইবে (গৃহ্যতে)। কোনও বিষয়ে পুনঃ পুনঃ যত্ন করার নাম অভ্যাস। বহির্ম্মুখী চঞ্চল মনকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া আত্মস্থ করিতে যে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা তাহাই অভ্যাস।

মন যে চঞ্চল ইহাও মূলে অভ্যাসের ফল। দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলে এই চাঞ্চল্য মনের স্বভাবে দাঁড়াইয়াছে। আবার স্থিরত্বের জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলেই সে স্থির হইতে পারিবে। অস্থির অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল বস্তুতে পুনঃ পুনঃ অভিনিবেশ বশতঃ মন অস্থিরতা অভ্যাস করিয়াছে। পুনরায় স্থিরতা বা নিত্য-বস্তুতে অভিনিবেশ বাড়ালেই মন স্থির হইয়া উঠিবে।

বৈরাগ্য বলিতে বিরাগের ভাব, নশ্বর বস্তুতে আসক্তিহীনতা বুঝায়। জগতের নশ্বর বস্তুর প্রতি আসক্তি কমাইতে হইলে অবিনশ্বর বস্তুতে আসক্তি বাড়ানো প্রয়োজন। সুতরাং অভ্যাস ও বৈরাগ্য মূলতঃ একটা কথারই এপিঠ ওপিঠ। অনিত্য বস্তু হইতে তুলিয়া লইয়া মনকে যতই নিত্য বস্তুতে অর্পণ করা যাইবে,

ততই উহা প্রশান্তভাব ধারণ করিবে। একযোগে অভ্যাস ও বৈরাগ্য দুইটি কথা বলিবার ইহাই তাৎপর্য্য।

অনিত্য বস্তুর দোষানুসন্ধান ও নিত্য বস্তুর গুণানুধ্যান ঐ অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত। আরাধ্য ইষ্টবস্তুকে প্রিয়তম বলিয়া অনুভব করিতে পারিলেই তুচ্ছ অনিত্য বস্তুর প্রতি আকর্ষণ মন্দীভূত হইয়া যায়। শাস্ত্রবিহিত উপায়ে সাধনে যত্নশীল ('যততা') হইলে নিশ্চয় সংসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে— "শক্যোঽবাপ্তুম্"—(৬।৩৬)।

ঊনিশ

যোগভ্রষ্ট-প্রকরণ

কথাটি অর্জ্জুন বুঝিয়াছেন। অভ্যাস বৈরাগ্য পথে কী উপায়ে মন শান্ত হয় তাহা অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। ভাবিতেছেন যে, ঐরূপ অভ্যাস করিয়া মন শান্ত করতঃ যোগাভ্যাস করিয়া সিদ্ধিলাভ করা হয়ত যাইতে পারে, কিন্তু সময় লাগিবে অনেক। ইহার মধ্যে সাধকের পথভ্রংশ হইতে পারে অথবা দেহান্তও হইতে পারে। তখন গতি কি হইবে?

এইরূপ ভাবিয়া **প্রশ্ন** করিয়াছেন—(৬।৩৭-৩৮)। অর্জ্জুন জানিতে চাহেন যে, শ্রদ্ধালু (শ্রদ্ধয়োপেতঃ) সাধক যদি যত্নের অভাবে (অযতিঃ) মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হন, অথবা আয়ুষ্কালের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন তাঁহার গতি কী হয়? ব্রহ্মসাধনের

পথ হইতে বিচ্যুত "বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি"—(৬।৩৮) হইয়া সে কি ছিন্ন মেঘখণ্ডের মত নাশ প্রাপ্ত হয়, কিংবা কোনপ্রকারে রক্ষা পায় ?

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—অর্জ্জুন, কল্যাণকারী ব্যক্তি কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হন না, এই কথাটি স্থির জানিয়া রাখ। ইহকালেই হউক, পরকালেই হউক, শুভকর্মকারী ব্যক্তি কুত্রাপি ছিন্ন মেঘের মত নাশপ্রাপ্ত হইতে পারে না।

সাধনের পথে যেটুকু চেষ্টা করা হউক না কেন—সেইটুকুই কল্যাণকর। সিদ্ধিলাভ যদি না-ও হয় তথাপি তাহার অশুভ গতি কুত্রাপি হইবার আশঙ্কা নাই। সিদ্ধিলাভ করিলে ত তাহার মুক্তিই হইল। মধ্যপথে ভ্রষ্ট হইবার জন্য তাহার পুণ্য-কর্মজনিত স্বর্গাদিবাস হয় দীর্ঘকাল "শাশ্বতীঃ সমাঃ"—(৬।৪১)। তারপর যদি ভোগবাসনার অবশেষ থাকে তাহা হইলে পবিত্র স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে"—(৬।৪১) তাহার পুনর্জ্জন্ম হয়।

আর যদি চিত্ত তাহার ভোগাকাঙ্ক্ষা-বিরহিত হয়, তাহা হইলে জ্ঞানশালী যোগীদিগের বংশে "ধীমতাং যোগিনামেব কুলে" (৬।৪২) জন্ম হয়। জগতে এবংবিধ জন্ম কিন্তু পরম দুর্লভ।

সাধক তাঁহার যোগসাধনায় পূর্ব্ববর্ত্তী জন্মে যতটুকু অগ্রসর হইয়া থাকেন, পরবর্ত্তী জন্মে সেইখান হইতে তাঁহার সাধনের যাত্রা আরম্ভ হয়—"বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্"—(৬।৪৩)। মোক্ষবিষয়ক জ্ঞান লইয়াই তাঁহার জন্ম হয়। প্রথমে কোন প্রবল বাধা বা যত্নাভাব তাঁহাকে ঠেকাইয়া রাখিলেও

শেষে দেখা যাইবে সাধক তাঁহার নির্দ্দিষ্ট মার্গেই চলিতেছেন "হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ"—(৬।৪৪)।

পরম যোগের স্বরূপ ও সাধন সম্বন্ধে সুষ্ঠুভাবে পরিজ্ঞাত হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা লইয়া "জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য"—(৬।৪৪)। যদি কাহারও দেহত্যাগ ঘটে, তিনিও পরজন্মে জ্ঞানলাভের যোগ্য হন। "স্বর্গপর জন্মকর্মফলপ্রদ" বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে তাঁহাকে আর পড়িতে হয় না। শব্দব্রহ্মরূপ বেদের কর্মপ্রবাহকে তিনি অতিক্রম করিয়া চলিয়া যান, "শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে"—(৬।৪৪)।

যত্নপরায়ণ হইয়া সাধনা করিলে নিশ্চয়ই নিষ্কলুষ (সংশুদ্ধ-কিল্বিষঃ) হইয়া পরাগতি লাভ করা যায়। হয়ত বা একটু সময় বেশী লাগিবে। হয়ত বা কতিপয় জন্ম কর্মভোগ করিতে হইবে (অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ), কিন্তু পরা গতি প্রাপ্তি অনিবার্য।

কুড়ি

প্রথম ষট্‌কের উপসংহার

অধ্যায়ের উপসংহারে দুইটি বিশিষ্ট মন্ত্র। একটিতে আদেশ, অপরটিতে নির্দ্দেশ। আদেশ করিয়াছেন অর্জ্জুনকে যোগী হইতে "যোগী ভবার্জ্জুন"—(৬।৪৬)। আর নির্দ্দেশ করিয়াছেন আমার মত (মে মতঃ) বলিয়া দৃঢ়ভাবে যুক্ত যোগিগণের মধ্যে সর্ব্বোত্তম কে, এই কথাটি।

যোগী সবার শ্রেষ্ঠ। তপস্বী অপেক্ষা সে বড়। কর্ম্মী অপেক্ষা সে বড়, জ্ঞানী অপেক্ষাও। অতএব অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও। সর্ব্বাপেক্ষা বড় যে তাহা হওয়াই ভাল।

যাহারা কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতাদি করেন তাঁহারা তপস্বী। যাহারা কাম্যকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা কর্ম্মী। যাহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞ তাঁহারা জ্ঞানী। যোগী ইঁহাদের সকলের বড়। কেন না যোগীর মধ্যে ইঁহাদের সকলের সমন্বয়। গীতোক্ত এই "যোগে" জ্ঞান, কর্ম্ম ও তপস্যার অপূর্ব্ব মহামিলন। যিনি যুক্তযোগী তিনিও জ্ঞানীও বটেন, কর্ম্মীও বটেন, তপস্বীও বটেন। সংক্ষেপে—তিনি পরম ভক্ত।

গীতা কর্মীর কর্ম্মকে অতীব উদার দৃষ্টিতে দেখিয়া জ্ঞানভূমিতে লইয়া গিয়াছেন। জ্ঞানভূমিকায় অখিল কর্ম্মের পরিসমাপ্তি দেখাইয়াছেন। তৎপর জ্ঞানীর জ্ঞানকে ধ্যানভূমিতে আনয়ন করিয়াছেন সুদৃঢ় করিবার জন্য। ধ্যানে হইবে তত্ত্বের দর্শন।

জ্ঞান হইবে বিজ্ঞানে পরিণত। ধ্যানীর জীবনক্ষেত্রে হইবে ধ্যানের দর্শনের ফলের প্রত্যক্ষাভিব্যক্তি।

ধ্যানের দর্শনের ফলটি কি? বাসুদেবকে সর্ব্বভূতে দর্শন, বাসুদেবে সর্ব্বভূতের দর্শন "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি"—(৬।৩০)। এই দর্শন যাঁহার লাভ হইল, তিনি সর্ব্বতোভাবে ত্যাগী হইয়াও অতি স্বাভাবিক ভাবেই সর্ব্বভূতহিতে রত হইয়া কর্ম্ম করিবেন। স্বার্থময় কর্ম্ম লয় পাইয়া যাইবে, তৎস্থলে নূতন করিয়া দেখা দিবে সর্ব্বভূতহিতময় কর্ম্ম। ইহা যুক্তযোগীর জীবনকে উজ্জ্বল করিবে।

এই যুক্তযোগীই ভক্তিযোগী। কথাটা প্রায় স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া ফেলিয়াছেন—যিনি আমার এই বাসুদেব স্বরূপে পরম শ্রদ্ধার সহিত মনঃপ্রাণ সমর্পণপূর্ব্বক ভজনা করেন—তিনিই সর্ব্বোত্তম।

যিনি ঐকান্তিক ভক্তিপরায়ণ হইয়া আমার ভজনা করেন তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী, সর্ব্বোত্তম সাধক। ইহাই আমার অভিমত জানিবে। "স মে যুক্ততমো মতঃ—(৬।৪৭)। শ্রীগীতার বক্তা আপনার পরম অভিমত এই রূপে ব্যক্ত করিলেন।

গীতার যাহা বক্তব্য প্রথম ষট্‌কে (প্রথম ছয় অধ্যায়ে) বলা হইয়া গেল। মোটামুটি এই কথাই আবার দ্বিতীয় ষট্‌কে (সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ে) বলিবেন। একই কথা দুইবার, কেন পুনরাবৃত্তি করিবেন? পুনরাবৃত্তি করিবেন না—দুইটি ভূমিকা হইতে দেখিয়া দুই রকম বলিবেন।

ভূমি হইতে পর্ব্বতের চূড়ার দিকে তাকাইয়া মনে করি কত

উঁচুতে। ঐ চূড়াকেই যখন বিমান হইতে দেখি তখন বলি, কত নীচুতে। যে যুদ্ধ করার কথা শুনিয়াছি অর্জুনের একান্ত কর্ত্তব্য, স্বধর্ম্ম, সেই যুদ্ধ করার কথা আবার শুনিব কর্ত্তব্যও নয়, স্বধর্ম্ম নয়, ইচ্ছাও নয়। উহাতে অর্জ্জুন নিমিত্তমাত্র, সে একটি ক্রীড়নক—একটি পুতুল। প্রথম দেখা অর্জ্জুনের ভূমিকা হইতে। দ্বিতীয় দেখা বিশ্বরূপের ভূমিকা হইতে। একটা ভূমির খবর আর একটা ভূমার খবর।

মানবীয় দৃষ্টিকোণ হইতে সমস্যাকে দেখা হইল। এখন ঈশ্বরীয় দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখা হইবে। 'ত্বং-এর কথা হইল, এখন 'তৎ'-এর কথা হইবে। তার পরের ধাপকে 'অসি।'— পার্থসারথির কৃপা থাকিলে সে সব কথা ক্রমে ব্যক্ত হইবে। "জয় জগদ্বন্ধু।"

সমাপ্ত

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩

অর্জ্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।
কথমেতদ্ বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন ।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৯
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥ ১২
চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩
ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫
কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬
কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮
যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ২১

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥ ২২

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥ ২৪

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥ ২৫

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥ ২৬

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥ ২৭

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাঽপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ২৮

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥ ২৯

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ॥ ৩০

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে ।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ ।
সর্ব্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন স্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪

যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব ।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন ।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি ।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্ ।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-
সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে জ্ঞানযোগো
নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীভগবান্ কহিলেন, এই অবিনাশী যোগ (কর্মযোগদ্বারক জ্ঞানযোগ) আমি সূর্যকে উপদেশ করিয়াছিলাম। সূর্য (তৎপুত্র) মনুকে এবং মনু (তৎপুত্র) ইক্ষ্বাকুকে এই যোগ বলেন। এইরূপে পরম্পরাক্রমে রাজর্ষিগণ এই যোগ অবগত হন। কিন্তু দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হওয়ায় সেই যোগ ইহলোকে লুপ্ত হইয়াছে।১।২

সেই পুরাতন উত্তম যোগজ্ঞান, পরম যোগ্য বলিয়া তোমাকে অদ্য আমি উপদেশ করিলাম। কারণ তুমি আমার ভক্ত ও সখা। ৩

অর্জ্জুন বলিলেন, তোমার জন্মের পূর্ব্বে সূর্যের জন্ম। তাই তুমি সৃষ্ট্যাদিতে সূর্যকে উপদেশ দিয়াছ, ইহা কী করিয়া বুঝিব ? ৪

শ্রীভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন ! তোমার ও আমার বহু বহু জন্ম অতিক্রান্ত হইয়াছে। হে শত্রুদমন। আমি যে সমস্তই জানি, কিন্তু তুমি জান না। ৫

আমার জন্ম নাই, বিনাশও নাই— আমি সর্ব্ব প্রাণীর ঈশ্বর। তথাপি নিজ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া নিজ মায়াবলে আমি জন্ম গ্রহণ করি (বস্তুতঃ আমি জন্মরহিত)। ৬

যখনই ধর্মের ক্ষীণতা ও অধর্মের বৃদ্ধি ঘটে, তখনই আমি (মায়াবলে) নিজেকে সৃষ্টি করি। সজ্জনের ত্রাণ ও দুর্জনের বিনাশার্থে এবং ধর্মকে সুস্থিত করার উদ্দেশ্যে আমি যুগে যুগে (এইরূপ) জন্মগ্রহণ করি। ৭।৮

এইরূপ আমার অপ্রাকৃত জন্ম ও কর্ম যিনি যথাযথরূপে জানেন তিনি এই দেহ ত্যাগ করিয়া আর দেহ (জন্ম) গ্রহণ করেন না— তিনি আমাকেই পান (মুক্ত হন)। ৯

যাহারা আসক্তি ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমাতেই চিত্ত নিবিষ্ট করিয়াছেন, আমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন এবং পরমাত্ম-জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হইয়াছেন, তাদৃশ বহু যোগীও ঈশ্বরভাব অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিয়াছেন। অর্থাৎ এই ভক্তিমার্গ অদ্যই প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা নহে। ১০

যেভাবে যে কামনা করিয়াই হৌক, যাহারা আমাকে সেবা করে, তাহাদিগকে আমি সেইভাবেই সেবা (অনুগ্রহ) করি। হে পার্থ! মনুষ্য সকলপ্রকারেই আমার ভজনমার্গই অনুসরণ (আমারই সেবা) করিয়া থাকে। ১১

বিবিধ কাম্যকর্মের ফল কামনা করিয়া ইহলোকে মানুষ ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি করে। কারণ এই সকল কর্মের ফল শীঘ্র পাওয়া যায় (জ্ঞানের ফল কৈবল্য দুর্লভ)। ১২

গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি ব্রাহ্মণাদি চারিটি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। এই বিভাগের কর্তা আমি হইলেও প্রকৃতপক্ষে আমি কর্তা বা সংসারী নহি ইহা জানিও। ১৩

কর্ম (সৃষ্ট্যাদি) আমাকে সংসারে আসক্ত করিতে পারে না। কর্মফলে কোন কামনাও আমার নাই। আমাকে এইরূপে যে জানে, তাহার কর্মও দেহারম্ভক হয় না। ১৪

পূর্ব্বে মুক্তিকামীরা আমাকে এইরূপে জানিয়া (অনাসক্ত হইয়া) কর্ম করিয়াছেন (তাই তাঁহারা বদ্ধ হন নাই)। অতএব জনকাদি পূর্ববর্তিগণও যেরূপ যুগে যুগে কর্ম করিয়া আসিয়াছেন, তদ্রূপ তুমিও কর্মই করিয়া যাও (কর্ম ত্যাগ করিও না)। ১৫

কর্ম কী এবং অকর্ম কী, এ বিষয়ে (গ্রহণ বর্জন বিষয়ে)

মেধাবীরাও মোহগ্রস্ত হন। তাই আমি তোমাকে কর্ম কী তাহা উপদেশ করিতেছি। তুমি ইহা জানিতে পারিলে অকল্যাণ (সংসার) হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। ১৬

কর্ম অর্থাৎ কর্তব্য কী, বিকর্ম অর্থাৎ বর্জনীয় কী এবং অকর্ম অর্থাৎ নীরব থাকা (অপ্রবৃত্তি) কী, ইহার তত্ত্ব জানিতে হইবে। কর্মাদির তত্ত্ব বড়ই দুর্জ্ঞেয়। ১৭

ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত কর্ম বন্ধহেতু হয় না, তাই তাহা অকর্ম (ফলাপ্রদ কর্ম)। বিহিত কর্মে উদাসীনতা বন্ধহেতু হয়, অতএব তাহা কর্ম (ফলপ্রদ) এই কর্মতত্ত্ব যিনি বুঝিতে পারেন, তিনিই মনুষ্য মধ্যে জ্ঞানী, তিনিই জ্ঞানযোগী, তিনিই সকল কর্মের অনুষ্ঠাতা। ১৮

যাহার সকল কর্মই কামনা ও সংকল্পবর্জিত, তাঁহার সকল কর্ম জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে (তাই ফল দেয় না)। তাঁহাকেই প্রাজ্ঞগণ পণ্ডিত বলিয়া বলেন। ১৯

যিনি কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া আকাঙ্ক্ষা বর্জনপূর্বক আশয়হীন হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হন, তিনি প্রকৃতপক্ষে কিছুই করেন না (তাঁহার কর্মই অকর্ম হয়)। ২০

যাহার কোন কামনা নাই, তিনি সকল পরিগ্রহ বর্জন করিয়া শরীরমাত্র ধারণের জন্য যে কর্মটুকু করেন, তাহাতে কোন (পাপ বা পুণ্য) কর্মফলই তাঁহাকে স্পর্শ করে না। ২১

যিনি অযাচিতভাবে যৎকিঞ্চিৎ পাইয়া (অথবা না পাইয়া) তুষ্ট থাকেন, যিনি শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করিয়াছেন, কাহারও প্রতি যাহার বৈরবুদ্ধি নাই, সিদ্ধিতে বা অসিদ্ধিতে যাহার হর্ষ বা বিষাদ হয় না, তিনি কর্ম করিয়াও বদ্ধ (কর্মফলভাগী) হন না। ২২

পূর্বোক্ত রূপে যিনি নিষ্কাম, রাগদ্বেষমুক্ত, জ্ঞানেই যাহার চিত্ত নিবিষ্ট, তিনি ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে যে কর্মই করুন না কেন, তাহা কোন (শুভাশুভ) ফল প্রসব করে না। ২৩

যজ্ঞাদিতে হবিরাদি সমর্পণ, অর্পিত হবিঃ প্রভৃতি, যজ্ঞাগ্নি, সেই যজ্ঞের হোতা—এই সকলই যিনি ব্রহ্মরূপে দেখেন, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মে চিত্ত অর্পিত ও সমাহিত করার ফলে ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন (ফলান্তর নহে)। ২৪

অপর কর্মযোগীরা কেহ কেহ ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করেন, আবার কেহ বা (ব্রহ্মজ্ঞ যোগী) ব্রহ্মাগ্নিতে আত্মাকে আহুতি দেন। ২৫

অপর কোন কোন যোগী ইন্দ্রিয়সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে আহুতি দেন। কেহ বা শব্দস্পর্শাদি পঞ্চবিধ বিষয়কে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন। ২৬

অন্য কোন যোগী আবার, সকল ইন্দ্রিয় ও প্রাণের ক্রিয়াকে, জ্ঞানদ্বারা প্রদীপ্ত আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন। ২৭

অপর কোন কোন তীব্রব্রত যোগী দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগ-যজ্ঞ (প্রাণায়ামাদি), স্বাধ্যায়যজ্ঞ (বেদপাঠ) ও জ্ঞানযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ২৮

কোন যোগী অপানবৃত্তিতে প্রাণবৃত্তি আহুতি দেন (পূরক নামে প্রাণায়াম করেন) ; কেহ বা প্রাণবৃত্তিতে অপানবায়ু আহুতি দেন (এইটি রেচক নামে প্রাণায়াম) ; কেহ বা প্রাণও অপানের গতি নিরুদ্ধ করিয়া প্রাণায়াম (কুম্ভক প্রাণায়াম) অনুষ্ঠান করেন। অপর কেহ বা পরিমিতভোজী হইয়া প্রাণবৃত্তিতে প্রাণকে আহুতি

দেন (যে বায়ু জয় করেন তাহাতে অপর বায়ুগুলি আহুতি দেন)। ২৯

এই যোগিগণ সকলেই যজ্ঞবেত্তা, ইঁহাদের সকল পাপপুণ্য, যজ্ঞদ্বারা অপগত হইয়াছে। ফলতঃ ইঁহারা যজ্ঞাবশেষ অমৃত ভোজন করিয়া নিত্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। যে কৌরবশ্রেষ্ঠ, যাহাদের যজ্ঞানুষ্ঠান নাই, তাঁহাদের ইহলোকই নাই—পরলোক ত দূরের কথা। ৩০-৩১

বেদবিহিত এই যজ্ঞসমূহ নানাবিধ, এই সমস্তই কর্মজনিত। তোমার এই জ্ঞান হইলেই মুক্তি লাভ হইবে। ৩২

দ্রব্যযজ্ঞ অর্থাৎ কর্মযজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেয়ান্। হে পার্থ, সকল প্রকারের সমস্ত কর্মই জ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত হয়। ৩৩

(যোগ্য আচার্যের নিকট গিয়া) প্রণাম, পরিপ্রশ্ন (কী করিয়া আমার সংসার হইল, কী করিয়া বা মুক্তি হইবে, এইরূপ) এবং সেবা (শুশ্রূষা) দ্বারা পূর্বোক্ত জ্ঞান লাভ করা যায়। (তবেই) সেই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীরা তোমাকে সেই জ্ঞান উপদেশ করিবেন। ৩৪

হে পাণ্ডুনন্দন! পূর্বোক্ত জ্ঞান লাভ করিলে তোমার আর এরূপ বুদ্ধিমোহ জন্মিবে না। এই জ্ঞানবলে তুমি সকল ভূতগণ (পিতা, পুত্র প্রভৃতি) আত্মাতে (নিজের সহিত অভেদে) দেখিবে এবং অতঃপর নিজেকে আমাতে (পরমেশ্বর বাসুদেবে অভিন্নরূপে) উপলব্ধি করিবে। ৩৫

যদি তুমি সকল পাপী মধ্যে পাপিষ্ঠও হও, তবু এই জ্ঞানের ভেলায় চড়িয়া সকল পাপ (পাপ সাগর) সমুত্তীর্ণ হইবে। ৩৬

হে অর্জ্জুন! যেমন সম্যক্ প্রদীপ্ত অগ্নি, ইন্ধনকে ভস্মে

পরিণত করে, তেমনি জ্ঞানরূপ অগ্নি সকল (পাপ-পুণ্য-ফলক) কর্মই ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। ৩৭

অতএব এই সমুদয় মধ্যে (তপস্যা যোগ ইত্যাদির মধ্যে) জ্ঞানের মতো পবিত্র কিছুই নাই। সেই (আত্মবিষয়ক) জ্ঞানকে দীর্ঘকাল ধরিয়া কর্মযোগবলে যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়া যোগী স্বয়ং (অনায়াসে) আত্মাতেই লাভ করেন। ৩৮

শ্রদ্ধাবান্, অভিযুক্ত এবং জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি (পূর্বোক্ত) জ্ঞান লাভে অধিকারী। এই জ্ঞান লাভ করিয়া (যোগী) অচিরেই পরম শান্তি (অর্থাৎ মোক্ষ) লাভ করেন। ৩০

যিনি অনাত্মজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন এবং সংশয়াকুল, তাঁহার বিনাশ হয় (তিনি স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হন)। (বিশেষতঃ) সংশয়াত্মা ব্যক্তির (ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা পাপী) ইহলোক নাই, পরলোকও নাই, সুখও নাই। ৪০

হে অর্জ্জুন! যোগবলে সকল কর্ম (ধর্মাধর্ম) যাহার ঈশ্বরে সমর্পিত হইয়াছে, আত্মজ্ঞানবলে যাহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে এবং যিনি অপ্রমত্ত, কোন কর্মই তাঁহাকে (ফল প্রদান করিয়া) বন্ধন করিতে পারে না। ৪১

হে ভরতবংশজ! অতএব আত্মার অবিবেক হইতে সঞ্জাত, হৃদিস্থিত (পাপিষ্ঠ) এই সংশয়কে জ্ঞান-খড়্গে ছিন্ন করিয়া (নিষ্কাম) কর্মযোগ অবলম্বন কর। যুদ্ধার্থ উদ্যোগী হও। ৪২

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি ।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি ।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে ।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫
সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ ।
পশ্যঞ্ শৃণ্বন্ স্পৃশঞ্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপঞ্ শ্বসন্ ॥ ৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্ নিমিষন্নপি ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯

ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২

সর্ব্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ ॥ ১৩

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥ ১৬

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ। ১৭

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্ ।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয়ঃ এব ত ।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬
স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্ম্মোক্ষপরায়ণঃ ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-
সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে কর্মসন্ন্যাস-
যোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

পঞ্চম অধ্যায়

অর্জ্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ, তুমি একবার কর্মত্যাগের কথা আবার কর্ম করার কথা বলিতেছ, এই উভয়ের মধ্যে যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল। ১

শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে অর্জ্জুন, সন্ন্যাস (কর্মত্যাগ) ও কর্মযোগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ, কিন্তু তাহা হইলেও এই উভয়ের মধ্যে কর্মত্যাগ করা অপেক্ষা কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ। ২

হে মহাবাহো, যিনি কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না, রাগ দ্বেষও করেন না, তাহাকে নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে। সেইরূপ রাগ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্ব-রহিত পুরুষই অনায়াসে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন। ৩

অজ্ঞ ব্যক্তিগণই সন্ন্যাস ও কর্মযোগকে পৃথক্ বলিয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ এইরূপ বলেন না। এই উভয়ের যে কোন একটি সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইলেও উভয়ের ফলই লাভ হইয়া থাকে। ৪

জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ যেস্থান লাভ করেন, কর্মযোগিগণও জ্ঞানদ্বারা সেই স্থানই প্রাপ্ত হন। যিনি জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগকে একই রূপে দেখেন তিনিই যথার্থদর্শী। ৫

হে মহাবাহো, কর্মযোগ বিনা কর্মসন্ন্যাস অতীব দুষ্কর। কিন্তু নিষ্কামকর্মবলে যোগযুক্ত সাধক অচিরেই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। ৬

যিনি নিষ্কাম কর্মযোগে যুক্ত, শুদ্ধচিত্ত, সংযতদেহ ও জিতেন্দ্রিয়

এবং সর্বভূতের আত্মায় যিনি আত্মদর্শী, এইরূপ সম্যগ্‌দর্শী পুরুষ কর্ম করিয়াও কর্মে লিপ্ত হন না। ৭

নিষ্কাম কর্ম্মযোগী ক্রমে তত্ত্বদর্শী হইয়া দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, নিঃশ্বাস গ্রহণ, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, চক্ষুর উন্মেষ ও নিমেষ প্রভৃতি কার্য্য করিয়াও মনে করেন—ইন্দ্রিয় সকলই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে—আমি কিছুই করিনা (ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করিলেও কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জনহেতু তাঁহার কর্ম-বন্ধন হয় না)। ৮–৯

যিনি ব্রহ্মে সমুদয় কর্ম স্থাপনপূর্ব্বক ফলাসক্তি ও কর্ত্তৃত্বা-ভিমান ত্যাগ করিয়া কর্ম করেন, তিনি পাপে লিপ্ত হন না, যেমন পদ্মপত্র জল-সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও জলদ্বারা লিপ্ত হয় না। ১০

নিষ্কাম কর্মযোগিগণ ফলকামনা ও কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কেবল শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কর্ম করিয়া থাকেন (তাই তাঁহাদের বন্ধন হয় না)। ১১

পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে কর্ম করিতেছি, ফললাভের জন্য নহে—এইরূপে কর্ম্মফল ত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্মযোগী সর্বদুঃখ-নিবৃত্তিরূপ স্থিরা শান্তি লাভ করেন। কিন্তু সকাম বহির্মুখ ব্যক্তি কামনা বশতঃ ফলে আসক্ত হইয়া বন্ধনদশা প্রাপ্ত হন। ১২

জিতেন্দ্রিয় পুরুষ (নিষ্কাম কর্মযোগী) মনে মনে সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নবদ্বারযুক্ত দেহে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করেন। তিনি নিজে কিছু করেন না, অন্যকেও কিছু করান না। ১৩

কারণ আত্মা মানুষের কর্ত্তৃত্ব কর্ম বা কর্মফলপ্রাপ্তি সৃষ্টি করেন না, কিন্তু (অবিদ্যারূপিণী মায়াশক্তি) প্রকৃতিই কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ১৪

সর্ব্বব্যাপী আত্মা কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। অজ্ঞান কর্ত্তৃক জ্ঞান আবৃত থাকে বলিয়াই জীবগণ মোহপ্রাপ্ত হয় (ঈশ্বরই শুভাশুভ কর্ম করান বলিয়া ভাবে)। ১৫

কিন্তু আত্মজ্ঞান দ্বারা যাহাদের অনাদি অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে তাঁহাদিগের আত্মজ্ঞান সূর্য্যবৎ পরমতত্ত্বকে প্রকাশ করিয়া দেয় (অর্থাৎ সূর্য যেমন অন্ধকার বিনাশ করিয়া সকল বস্তু প্রকাশ করে সেইরূপ আত্মজ্ঞান জীবের সকল অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া পরম পুরুষকে প্রকাশ করিয়া দেয়)। ১৬

যাহাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মে যাহাদের আত্মভাব ও নিষ্ঠা, যাহারা ব্রহ্মপরায়ণ, ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা যাহাদের সমস্ত পাপ-পুণ্য বিধৌত হইয়াছে, তাঁহারা মোক্ষ লাভ করেন, তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না। ১৭

বিদ্যাবিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে, গো, হস্তী ও কুক্কুরে ব্রহ্ম-জ্ঞানিগণ সমদর্শী হন (অর্থাৎ সর্ব্বত্র একই ব্রহ্ম বস্তু দর্শন করেন)। ১৮

যাহাদের মন সর্ব্বভূতস্থ ব্রহ্মে নিশ্চল (স্থির), তাঁহারা ইহলোকে থাকিয়াই এই জনন-মরণরূপ সংসার অতিক্রম করেন। যেহেতু ব্রহ্ম সম ও নির্দোষ, সুতরাং সেই সমদর্শী পুরুষগণ ব্রহ্মেই অবস্থিতি করেন (অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন)। ১৯

ব্রহ্মই সর্ব্বভূতে এক আত্মরূপে বিরাজিত—এই প্রকার স্থির বুদ্ধি ও জ্ঞান দ্বারা মোহশূন্য, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ প্রিয়বস্তু পাইয়া উৎফুল্ল হন না বা অপ্রিয় বস্তু পাইয়া উদ্বিগ্নও হন না। ২০

যিনি বাহ্য বিষয়ে অনাসক্ত (ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত), তিনি আত্মায় যে আনন্দ আছে, তাহা লাভ করেন। ফলে ব্রহ্মযোগযুক্ত হইয়া তিনি অক্ষয় ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হন। ২১

হে অর্জ্জুন ! বিষয়ভোগজনিত যে সকল সুখ সে সকল নিশ্চয়ই

দুঃখের হেতু এবং আদি ও অন্ত-বিশিষ্ট। বিবেকী ব্যক্তি উহাতে রত হন না। ২২

এই জীবনেই যিনি আমরণ কাম ও ক্রোধের বেগ ধারণ করিতে পারেন, তিনিই যোগী, তিনিই সুখী। ২৩

আত্মাতেই যাহার সুখ, আত্মাতেই যাহার ক্রীড়া বা আনন্দ এবং যাহার অন্তরে আত্মার আলোকই দেদীপ্যমান, সেই সমাহিত-চিত্ত পুরুষ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মে নির্বাণ প্রাপ্ত হন। ২৪

যাহারা নিষ্কাম কর্মদ্বারা পাপমুক্ত, শ্রবণ ও মনন দ্বারা সংশয়-মুক্ত ও জিতেন্দ্রিয় এবং সর্বভূতের হিতে রত, সেইরূপ ঋষিগণ ব্রহ্ম-নির্বাণ (মোক্ষ) লাভ করেন। ২৫

কামক্রোধ হইতে মুক্ত, সংযতচিত্ত, আত্মদর্শী যতিগণের উভয়তঃ ব্রহ্মনির্বাণ বিরাজ করে (অর্থাৎ তাঁহারা এই দেহে এবং দেহান্তে ব্রহ্মভাব বা মোক্ষ লাভ করেন)। ২৬

মন হইতে বাহ্য বিষয় (বিষয়-চিন্তা) দূর করিয়া, চক্ষুর্দ্বয়কে ভ্রূমধ্যে স্থাপন করিয়া প্রাণ ও অপান বায়ুকে (কুম্ভক দ্বারা) নাসাভ্যন্তরে স্থির করিয়া, যিনি ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়াছেন এবং যিনি ইচ্ছা ভয় ক্রোধ বর্জিত সেই মোক্ষপরায়ণ মুনি (জীবদ্দশাতেই) মুক্ত। ২৭-২৮

(ভক্তগণকৃত) সকল যজ্ঞ ও সকল তপস্যার ভোক্তা বা পালক, ব্রহ্মাদি সকল লোকের পরম ঈশ্বর এবং সকল জীবের (অকারণ) মিত্র বলিয়া আমাকে যে জানে, সেই (আমার প্রসাদে) পরা শান্তি অর্থাৎ (মোক্ষ) লাভ করে (ইন্দ্রিয় সংযম মাত্রেই মুক্তি হয় না, আমাকে তত্ত্বতঃ জানা চাই)। ২৯

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্যং কর্ম্ম করোতি যঃ ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ১
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে ।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে ।
সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮
সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীন-মধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু ।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ১৬
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্‌ ।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।
যস্মিন্‌ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্‌ ।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩

সংকল্পপ্রভবান্‌ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্‌ ।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্‌ ।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্‌ ॥ ২৭

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি ।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২

অর্জ্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন ।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬

অর্জ্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি ।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯

শ্রীভগবানুবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে ।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪
প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদগতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-
সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে ধ্যানযোগো
নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীভগবান্ কহিলেন, যিনি কর্মফলে কামনা ত্যাগ করিয়া কর্তব্য (নিত্য) কর্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী। অগ্নি-সাধ্য যাগাদি কর্ম ত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হয় না বা অনগ্নিসাধ্য তপোদানাদি কর্ম ত্যাগ করিলেই যোগী হয় না (বস্তুতঃ সর্বত্র ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করা চাই, তবে কর্ম করিলেও হানি নাই)। ১

হে পাণ্ডুনন্দন। যাহা কর্মসন্ন্যাস বলিয়া বর্ণিত হয়, তাহাই যোগ বলিয়া জানিও। ফলসংকল্প পরিত্যাগ না করিলে তো কেহ কর্মযোগী হইতে পারে না। ২

যোগমার্গে আরোহণেচ্ছু মুনির (নিষ্কাম) কর্মই সাধন। কিন্তু যোগমার্গে আরূঢ় হইলে তাঁহার পক্ষে সকলকর্ম-ত্যাগই সাধন। ৩

যখন শব্দাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ে বা তৎসাধন কর্মে যোগীর আসক্তি থাকে না, তখন সমস্ত সংকল্পই পরিত্যাগ করায় তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা হয়। ৪

(যোগারূঢ় যোগীর পক্ষে) আত্মাকে (বিবেকযুক্ত) আত্মা দ্বারাই উদ্ধার করিতে হয়—কখনও নিজেকে অবসন্ন (অধোগামী) করিতে নাই। আত্মাই আত্মার বন্ধু (অপর কেহ বন্ধু নাই), আবার আত্মাই আত্মার শত্রু (বন্ধের কারণ বলিয়া শত্রুবৎ)। ৫

(কাহার আত্মা মিত্র ?) যিনি আত্মাকে আত্মা দ্বারা জয় করিয়াছেন, তাঁহার আত্মা তাঁহার মিত্র। যিনি অজিতাত্মা (অজিতেন্দ্রিয়), তাঁহার আত্মাই তাঁহার শত্রুবৎ অপকারী। ৬

যিনি জিতেন্দ্রিয় রাগদ্বেষশূন্য এবং শীতোষ্ণ সুখদুঃখমানাপ-

মানে সমবুদ্ধি তিনিই আত্মভাবে স্থিত। অতএব সুখদুঃখাদিতে অবিচলিত ও প্রশান্ত থাকিবে। ৭

যিনি ঔপদেশিক জ্ঞান এবং প্রত্যক্ষানুভব এই উভয়ের দ্বারা তৃপ্ত (সকল বিষয়ে নিরাকাঙ্ক্ষ), বিষয়সন্নিধানেও অবিকৃত, নির্বিকার, সম্যক্ জিতেন্দ্রিয় এবং প্রস্তর ও সুবর্ণে তুলাবুদ্ধি, সেই যোগীকেই যুক্ত বা যোগারূঢ় বলা হয়। ৮

সুহৃৎ (অকারণোপকারী), মিত্র (স্নেহশীল) শত্রু (অপকারক), উদাসীন, উভয়হিতৈষী এবং সজ্জন ও দুর্জনে যিনি তুল্যবুদ্ধি, তিনিই শ্রেষ্ঠ (যোগারূঢ়-মধ্যে উত্তম)। ৯

যোগী (ধ্যানকারী) সর্ব্বদা পর্ব্বতগুহাদি নির্জনস্থানে সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক চিত্তকে সমাহিত করিবেন। তিনি একাকী থাকিবেন, দেহ ও মনকে সংযত করিবেন এবং আকাঙ্ক্ষা ও পরিগ্রহ বর্জন করিবেন। ১০

(এক্ষণে আসন আহার বিহারাদির নিয়ম বলা হইতেছে) যোগী পরিশুদ্ধ স্থানে নিজের নাত্যুচ্চ নাতিনীচ এবং কুশ চর্ম্ম ও বস্ত্র দ্বারা স্থির আসন রচনা করিবেন। সেই আসনে উপবেশন করিয়া চিত্ত একাগ্র (বিক্ষেপশূন্য) করিয়া, মন ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত করিয়া তিনি অন্তঃকরণশুদ্ধির জন্য সমাধিতে রত হইবেন। ১১-১২

(এক্ষণে দেহধারণার প্রক্রিয়া বলা হইতেছে)

যোগী অতঃপর দেহ মস্তক ও গ্রীবা সরল ও নিশ্চল করিয়া, স্থির হইয়া, নিজ নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া, কোন দিকে না দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া (তন্ময় হইয়া), প্রশান্তচিত্ত, ভয়মুক্ত ও ব্রহ্মচারি-ব্রতে

অবস্থিত হইবেন। তিনি চিত্ত (বিষয় হইতে) সংহৃত করিয়া আমাতেই মনোনিবেশ করিয়া এবং আমাকেই পরমপুরুষার্থ মনে করিয়া যোগনিরত হইবেন। ১৩-১৪

এইরূপে যোগী সর্ব্বদা সংযতচিত্ত হইয়া মনকে সমাহিত করিবেন। ফলে তিনি মোক্ষরূপ পরম শান্তি লাভ করিয়া আমার স্বরূপে অবস্থান করিবেন। ১৫

অত্যধিক ভোজন বা অত্যল্প ভোজন করিলে সেই যোগীর সমাধিলাভ হয় না। অত্যধিক নিদ্রাপরায়ণ বা একান্ত জাগর-শীলের (নিদ্রাহীনের) ও যোগ হয় না। ১৬

যাহার আহার ও বিহার নিয়ত, যিনি পরিমিত কর্মশীল, নিদ্রা ও জাগরণ যাহার পরিমিত, তাঁহার সমাধি সকল সংসারদুঃখকে ক্ষয় করে। ১৭

চিত্ত একান্ত নিরুদ্ধ হইলে সেই একাগ্র চিত্ত যখন কেবল আত্মাতেই স্থিতি লাভ করে, যোগী যখন ইহপরলোকের সকল ভোগে নিস্পৃহ হন, তখনই তিনি প্রাপ্তযোগ হন। ১৮

বায়ুহীন স্থানে অবস্থিত প্রদীপ বিচলিত হয় না। সেই প্রদীপ আত্মবিষয়ে যোগপরায়ণ, অবিচলিতচিত্ত যোগীর উপমাস্থল বলিয়া যোগজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন। ১৯

যখন যোগানুষ্ঠানবলে সকল বিষয় হইতে নিবারিত হইয়া চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া শান্ত হয়, যখন শুদ্ধ অন্তঃকরণ পরম চৈতন্যকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই তুষ্ট হয়; যেখানে আত্যন্তিক (অনন্ত) ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ বুদ্ধিমাত্র দ্বারা গ্রাহ্য সুখ অনুভূত হয়; যে সময়ে যোগী আত্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়া তত্ত্বস্বরূপ হইতে বিচ্যুত হন না; যে

আত্মতত্ত্ব লাভ করিয়া যোগী অন্য কোন লাভই তাহার অধিক বলিয়া মনে করেন না; যে আত্মস্বরূপে স্থিত হইয়া যোগী পরম দুঃখ কষ্টে (অস্ত্রাঘাতাদিতে) ও বিচলিত হন না; সেই অবস্থায় দুঃখের সংস্পর্শমাত্র থাকে না; তাহাই যোগ বলিয়া জানিও। সেই যোগই নির্ব্বেদরহিত চিত্তে অধ্যবসায় সহকারে অভ্যাস করিতে হইবে। তখন সংকল্পজনিত সমস্ত (যোগপ্রতিকূল) কামনা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া বিবেকযুক্ত মন দ্বারা সকল বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিতে হইবে। ২০-২৪

যোগী ধীরে ধীরে (অতিব্যগ্র বা অধীর না হইয়া) ধারণা (যোগাবস্থাবিশেষ) দ্বারা চিত্তকে আত্মাতেই স্থির ও নিশ্চল করিয়া উপরত (বিষয়-নিবৃত্ত, অচঞ্চল) হইবেন এবং (অন্য) কিছুই চিন্তা করিবেন না। ২৫

(স্বভাবচঞ্চল) মন যে যে কারণে সমাধিভ্রষ্ট হইয়া বিচলিত হয়, সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া আত্মাতেই নিবিষ্ট করিয়া রাখিবে। ২৬

এইরূপে (যোগাভ্যাসের ফলে) যোগীর চিত্ত একান্ত শান্ত (বিক্ষেপশূন্য) হইলে তাঁহার মোহাদি ক্লেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ধর্মাধর্মাদিবর্জিত ব্রহ্মভূত পরম সুখ (জীবন্মুক্তাবস্থা) সেই যোগীকে আশ্রয় করে। ২৭

যোগী এইভাবে সর্ব্বদা চিত্তকে বশে আনিয়া অপগতপাপ হইয়া অনায়াসে অত্যুৎকৃষ্ট সুখ প্রাপ্ত হন। ২৮

যোগবলে সমাহিতচিত্ত যোগী সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হইয়া আত্মাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখিতে পান এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে (ব্রহ্মে)

স্থিত দেখিতে পান (এইটি হইল সমাধির ফল, ব্রহ্মৈকত্ব দর্শন)। ২৯

যিনি আমাকে সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতে) দেখেন এবং আমাতেই সর্ব্বভূত অবস্থিত দেখিতে পান, তাঁহার (সেই ব্রহ্মৈকত্বদর্শীর) নিকট আমি পরোক্ষ হই না, বা তিনিও আমার পরোক্ষ হন না (আমি সর্ব্বদাই কৃপাদৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে দেখি ও অনুগ্রহ করি)। ৩০

আমি সর্বভূতে অবস্থিত, এই অভেদ দৃষ্টিতে যে যোগী আমাকে ভজনা করেন, তিনি সর্ব্বকর্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাতেই অবস্থান করেন (তিনি নিত্যমুক্ত, কখনও ভ্রষ্ট হন না)। ৩১

নিজের মতো যিনি সর্ব্বভূতকে দেখেন, তাহাদের সুখদুঃখ ও নিজেরই সুখদুঃখ, এইরূপ ভাবেন, তাদৃশ সম্যগ্দর্শী (সর্ব্বানুকম্পী) যোগীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ৩২

অর্জ্জুন বলিলেন (প্রশ্ন করিলেন)—হে মধুসূদন, এই যে মমত্বরূপ যোগের (সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি এবং আত্মৌপম্যে আচরণের) কথা তুমি বলিলে, মন চঞ্চল বলিয়া আমি এ যোগের অচলা স্থিতি কিরূপে হয় বুঝি না। ৩৩

হে কৃষ্ণ! মন (স্বভাবত) চঞ্চল, (শরীরেন্দ্রিয়ের) বিক্ষেপণ-শীল এবং অতি প্রবল (দুর্দম) ও দুর্ভেদ্য। তাই আমি তাহাকে (মনকে) নিগৃহীত করা, বায়ুকে নিরোধ করার মতোই অতি দুষ্কর মনে করি (তবে যোগসিদ্ধির উপায় কী?)। ৩৪

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহো। মন যে অতিচঞ্চল এবং দুর্নিরোধ তাহাতে সন্দেহ নাই (তুমি যথার্থই বলিয়াছ)। হে

কুন্তীনন্দন! তথাপি অভ্যাস ও বৈরাগ্য (বিষয়ে বিতৃষ্ণা) দ্বারা মনকে (যত্নের ফলে) নিগৃহীত করা যায় (যায় না এমন নহে, তবে ক্রমে ক্রমে তাহা কর্ত্তব্য)। ৫৫

আমার অভিমত এই যে চিত্ত (অভ্যাস-বৈরাগ্য দ্বারা) সংযত না হইলে তাহার পক্ষে সমাধি দুর্লভ। যাহার চিত্ত অভ্যাস-বৈরাগ্য অনুশীলনে বশে আসিয়াছে তাহার পক্ষে প্রযত্নপূর্ব্বক পূর্ববর্ণিত উপায় অনুষ্ঠানের ফলে (ক্রমে ক্রমে) যোগ প্রাপ্তি সম্ভবপর। ৩৬

অর্জ্জুন (পুনরায়) প্রশ্ন করিলেন—হে কৃষ্ণ! প্রথমত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যোগে প্রবৃত্ত হইয়াও পরে শিথিলযত্ন (ভ্রষ্টস্মৃতি) হইয়া যোগী যোগসিদ্ধি (যোগফল সম্যগ্‌দর্শন) লাভ করিতে অসমর্থ হইলে, তাহার কী গতি হয়?। ৩৭

সেই (অপ্রাপ্তযোগ) যোগী কি উভয়পথ (জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গ) হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, নিরাশ্রয় হইয়া, ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে বিমূঢ় হইয়া ছিন্ন মেঘের মতো বিনষ্ট হয় (অথবা কোন উপায়ে রক্ষা পায়)? ৩৮

হে কৃষ্ণ। তুহি আমার এই সংশয় সম্পূর্ণরূপে অপনীত কর। তুমি ছাড়া এই সংশয় দূর করিতে কেহই পারিবে, সম্ভবপর নহে (অতএব তুমিই কর)। ৩৯

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে পার্থ! ইহলোকে বা পরলোকে সেই (যোগভ্রষ্ট) যোগীর বিনাশ (পতন) হইতে পারে না। ওহে তাত অর্জ্জুন! শুভকর্ম্মকারী মানব কেহই (কখনও) দুর্গতি লাভ করে না। ৪০

সেই যোগভ্রষ্ট যোগী (দেহান্তে) পুণ্যকর্ম্মা লোকের গতি

(স্বর্গাদি) প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল সেই লোকে বাস করিয়া (কালবশে) পবিত্র-চরিত ঐশ্বর্যবান্ লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ৪১

অথবা জ্ঞানবান্ (দরিদ্র) যোগীর গৃহে ও তাঁহার (সেই যোগভ্রষ্ট যোগীর) জন্ম হইতে পারে। পূর্ব্বাপেক্ষা এইরূপ জন্ম দুর্লভ। ৪২

হে কৌরব! সেইস্থানে (যোগিকুলে) জন্ম হইলে পূর্বজন্মের ব্রহ্মবুদ্ধির সঙ্গে সেই (যোগভ্রষ্ট) যোগী সংযুক্ত হয়। অতঃপর (পূর্বসংস্কারবশে) যোগসিদ্ধির জন্য সে অধিকতর প্রযত্ন করে। ৪৩

সেই যোগভ্রষ্ট যোগী পূর্বজন্মের অভ্যাসবশে অবশ হইয়াও (যোগের পথে) নীত হইবে। তখন সে যোগের স্বরূপজিজ্ঞাসু হইয়াই বেদবিহিত কর্ম্মমার্গ অতিক্রম করিয়া যাইবে (তাহার আর কর্ত্তব্য কর্ম থাকিবে না, সে জীবন্মুক্ত হইবে)। ৪৪

ক্রমে ক্রমে সেই যোগী অধিকতর যত্ন করিয়া বিমুক্তপাপ হইয়া অনেক জন্ম ধরিয়া অল্প অল্প করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া পরিশেষে অত্যুত্তম গতি (মোক্ষ) লাভ করে। ৪৫

হে অর্জ্জুন! যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, (নিষ্কাম) কর্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তুমি যোগী হও (যোগবলে সিদ্ধিলাভে যত্ন কর)। ৪৬

আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে যে যোগী আমাকেই ভজনা করে, যোগীর মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ, এইটি আমার অভিমত। ৪৭

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত

গীতা-ধ্যান প্রথম খণ্ড সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত—

উদ্বোধন বলেন—

শ্রীযুক্ত মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর "গীতা-ধ্যান" বিরাট গীতাসাহিত্যে এক নূতন সংযোজন। ...গভীর আগ্রহের সহিত নূতন আলোর আশায় তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। পাঠ করিয়া লাভবান্ হইয়াছি। * *

গীতা যে কেবল সন্ন্যাস-শাস্ত্র নহে, কেবল কর্ম্ম-শাস্ত্র নহে, কেবল ভক্তি-শাস্ত্র নহে, ইহা জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির সমুচ্চয় শাস্ত্র, অতি নিপুণতা-সহকারে গ্রন্থকার তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। * * *

দৈনিক বসুমতী বলেন—

* * * রবীন্দ্রনাথ একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন, গীতার ঠিক ইতিহাসটি পাওয়া গেলেই ওর হেঁয়ালীর মীমাংসা পাওয়া যেত। গীতার মধ্যে কোন একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ প্রয়োজনের সুর আছে। তাই ওর নিত্য অংশের সঙ্গে একটা ক্ষণিক অংশ জড়িয়ে গিয়ে কিছু যেন বিরোধ বাধিয়েছে।" **"গীতা-ধ্যান"** পড়লে এই বিরোধের সমাধান হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুতপূর্ব্ব রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ. বি. এল্, পি. এইচ্. ডি, **বলেন—**

"গীতা-ধ্যান" বইখানি পরম আনন্দ ও আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। হিন্দুর মহাগ্রন্থ এই গীতাকে আপনি সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিয়াছেন ও ইহার উপর সম্পূর্ণ নূতন আলোকপাত করিয়াছেন।

* * *

আপনার গ্রন্থখানি শ্রোতার দিক্ হইতে লেখা—ভগবানের বাণী শ্রোতার মনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিল, তাহার কোন্ সংশয় নিরসন করিল, তাহার কোন্ অস্পষ্ট পরস্পরবিরোধী অনুভূতিকে সুস্পষ্ট উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত করিল, তাহার মনের আঁধার কেমন করিয়া ধীরে ধীরে কাটিয়া গিয়া সেখানে সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের সূর্য্যালোক জলিয়া উঠিল, আপনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তাহাই বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

সুসাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেন—

আপনার **"গীতা-ধ্যান"** একটি বিস্ময়কর গ্রন্থ। গীতার অন্তর্নিহিত অভ্রান্ত অর্থটিকে উপলব্ধির সহজ আলোতে উদঘাটিত করিয়াছেন। * *

গীতা-ধ্যান

প্রথম খণ্ড সম্বন্ধে তৎকালীন ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা

The Free Lance বলেন—

...In the book under review the author has sought to explain the cardinal tenets of the Geeta in the light of his vast scholarship sublimated by his spiritual experience. A man with deep and extensive knowledge both of Eastern and Western philosophies, the writer has earned international reputation for his learned discourses on religious topics. 'Geeta Dhyan' bears the unmistakable stamp of a mind enlightened not only by academic wisdom but supersensuous experience. From this point of view, the book has got a distinctiveness of its own. The style is characterised by lucidity and a conversational flavour. The originality of approach and charm of language will make the book attractive as much to the common reader as to those well-versed in scriptural literature.

Tapan Bose [Calcutta, Wednesday, October 19, 1955]